ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা
জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১/আষাঢ় ১৪০৮

সম্পাদনা পরিষদ

মোশারফ হোসেন
শেখ আলতাফ আলী
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কাজী হাসান ইমাম
বেগম কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১/আষাঢ় ১৪০৮

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৮

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেইল	ঃ	bpatc@bangla.net
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	**ইছামতি অফসেট প্রেস** ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭, ৯৩৩৬০৩৮

LOKPRASHASON SAMOEEKY
Vol. 19, June 2001/Ashar 1408

Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre
Editor : S. M. Zobayer Enamul Karim

© Bangladesh Public Administration Training Center 1408

Telephone	:	7710010-16 (PABX)
Fax	:	7710029
E-Mail	:	bpatc@ bangla. net
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১/আষাঢ় ১৪০৮

সূচিপত্র

বাংলাদেশে চালের বাজারের একটি সমীক্ষা ঃ
চট্টগ্রাম পরিপ্রেক্ষিত ১
এ, জে, এম, ফারুক

প্রকল্প চক্র ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন পক্রিয়া ২৫
এস, জে, আনোয়ার জাহিদ

সামাজিক গবেষণায় প্রতিবেদন লিখন ঃ পদ্ধতি ও কৌশল ৪৫
রহমত আলী-ছিদ্দিকী

নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব
একটি জরিপ ভিত্তিক বিশ্লেষণ ৬৭
খন্দকার ওমর মুয়ীদ

সংবাদপত্রে ২০০০ সালের পরীক্ষা ভাবনা ঃ
একটি পর্যালোচনা ৮৩
ড. মোহাম্মদ হান্নান

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

বাংলাদেশে চালের বাজারের একটি সমীক্ষা ঃ চট্টগ্রাম পরিপ্রেক্ষিত

এ, জে, এম, ফারুক *

A Study on Rice Market in Bangladesh : Chittagong Perspective.

- A. J. M. Farooque

Abstract : This article examines the factors that influence seasonal variation in prices of rice in Bangladesh, utilizing date for the Chittagong terminal market. It explains the significance of government offtake from public stock, and the activities of private traders to price formation and seasonal price fluctuation. Using a regression model, it leads to the finding that government intervention does not have any significant stabilizing influence on price fluctuations, confirming findings of an earlier study. Exploring the activities of private traders,it is shown that their profitability has steadily declined mainly due to the nature of seasonal price movement, which, in turn, is influenced by the internal procurement program of the government, the large scale milling capacity bullet up since the 1980's and the growing importance of boro crop. The paper concludes with a few recommendations for a more accurate assessment of factors influencing seasonal price fluctuations.

ভূমিকা

দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত চালের মাসিক খুচরা দামের পর্যালোচনায় বিভিন্ন মাসের দামের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য প্রকাশ পায়। দামের ব্যাপক পরিবর্তন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। চালের দাম বৃদ্ধি শহুরে দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র কৃষক, যাদেরকে মৌসুমের শেষে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাজার

---

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

হতে চাল ক্রয় করতে হয়,তাদের উদ্বেগের বিষয়। আবার, কৃষি খামার পর্যায়ে, দামের একটা বৃহৎ হ্রাস আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের উদ্দীপনাকে গুরুতরভাবে হ্রাস করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারের খাদ্যনীতি, দাম স্তরকে এমন একটা পর্যায়ে স্থির রাখার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, যে স্তর কৃষককে পর্যাপ্ত মুনাফা প্রদান করে এবং তুলনামূলক স্থিতিশীল দামে পর্যাপ্ত শস্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। সরকারের অভ্যন্তরীন (খাদ্যশস্য) সংগ্রহ কর্মসূচী (Internal Procurement Program) এবং গণ খাদ্য শস্য বিতরণ ব্যবস্থা (Public Foodgrain Distribution System PFDS) এ সকল উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করা হয় (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়'৮৫) PFDS এর মাধ্যমে ছয় ক্যাটাগরিতে খাদ্য শস্য বিতরণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, নিত্য প্রয়োজনীয় গুরুত্ব (Essential Priority বা EP), বিধিবদ্ধ সংবিভাগ (Statutory Rationing বা SR), পল্লী সংবিভাগ (Palli Rationing বা PR), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (Food for Works Program বা FWP), দুস্থ দল উন্নয়ন (Vulnerable Group Development বা VGD) এবং খোলা বাজারে বিক্রয় (Open Market Sale বা OMS)। ১৯৮০ এর সময় কালে উপস্থাপিত রেশনিং এর কাঠামোতে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে; গণ খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS) এর অধীনে বিধিবদ্ধ সংবিভাগ (SR) হতে গুরুত্ব খোলা বাজারে বিক্রয় (OMS) এ স্থানান্তরিত হয়েছে এবং পল্লী এলাকায় পল্লী সংবিভাগ (PR), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী FWP) এবং দুস্থ দল উন্নয়ন (VGD) কর্মসূচীর অধীনে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৯০)। এ উদ্দেশ্য প্রতিপালনে এ পর্যন্ত গৃহীত সরকারী নীতি সমূহের কার্যকারিতা, বিশেষ করে, তুলনামূলক স্থিতিশীল দামে পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য যোগানের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন পরীক্ষা করা প্রাসঙ্গিক। যেহেতু, বেসরকারী ব্যবসায়ীগণ (private traders) খোলা বাজারে খাদ্য শস্য বিতরণের প্রধান কার্যাবলী পালন করে থাকে, তাই এক্ষেত্রে তাদের কার্যপ্রণালী এবং খোলা বাজারে দাম নির্ধারণ ও দাম স্থিতিশীলতার উপর বিদ্যমান তাদের যে কোন প্রভাবও (যদি থাকে) নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এ সমীক্ষায় চালের গুদামজাতকরণ খরচের প্রাক্কলন দেয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীন উৎপাদনে, সরকারী সরবরাহ (offtake), বেসরকারী বাণিজ্য কারকদের

প্রত্যাশা ও চালের বাজার দাম এবং তার উত্থান পতনের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক পরীক্ষার নজ্য একটা সরলীকৃত নমুনা (model) ব্যবহার করে বিশ্লেষনের কাঠামো প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া আন্তঃ মৌসুমি দামের উত্থান-পতনের নির্ধারক সমূহ বিশেষ করে এ সকল উত্থান পতনের উপর সরকারী offtake এর প্রভাব পর্যবেক্ষনের জন্য একটা Regression model ব্যবহৃত হয়েছে। বেসরকারী বাণিজ্য কারকদের কার্য সম্পাদন প্রণালী এবং দামের মৌসুমি তারতম্যের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাবও বিশ্লেষন করা হয়েছে। সব শেষে প্রাপ্ত প্রধান তথ্য সমূহের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

যে দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে সেগুলো হলো (ক) চট্টগ্রামের প্রান্তীয় বাজারে (terminal market) চালের দামের মৌসুমি তারতম্যের জন্য দায়ী উপদানসমূহ চিহ্নিত ও অধ্যয়ন করা, এবং সুনির্দিষ্টভাবে সরকারী মজুদ হতে সংগ্রহ (Public offtake) যেভাবে দামের মৌসুমি তারতম্যকে প্রভাবিত করে তা' বিশ্লেষন করা; এবং (খ) বেসরকারী ব্যবসায়ীগণ কিভাবে চালে দামের মৌসুমি তারতম্যকে প্রভাবিত করে তা' চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করা।

এ সমীক্ষার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সমগ্রক (population) হিসেবে চট্টগ্রাম শহর এলাকায় অবস্থিত পাহাড়তলী এবং চাক্তাই পাইকারী বাজারকে (যেখানে আড়তদারদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিদ্যামান) বিবেচনা করা হয়েছে। দৈবচয়নের (random) ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচনের পর নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সহায়তায়, পাইকারী বিক্রেতাদের নিকট সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জরিপ ২০০২ সালের জানুয়ারীতে পরিচালিত হয়। অনুরূপ একটি জরিপ ১৯৮৫-৮৬ সালেও পরিচালিত হয়েছে এবং ১৯৭৮-৯৯ সময় কালের, দাম এবং উৎপাদনের মাধ্যমিক (secondary) উপাত্ত খাদ্য বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ১৯৭৮-১৯৯০ সময়কালে সরকারী মজুদ

হতে offtake সম্পর্কিত উপাত্ত, "A Data Base on Agriculture & Foodgrain in Bangladesh" (হামিদ ১৯৯১ ঃ ১৫৬-১৫৭) থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

চাল সংরক্ষণে খরচ

চট্টগ্রামের পাইকারী দোকান এবং পণ্যগার সমূহের গড় মাসিক সংরক্ষণ খরচ সারণী ১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ খরচের মধ্যে রয়েছে মজুরী, ভাড়া, সুদ, ক্ষয়ক্ষতির খরচ এবং পরিবহন ইত্যাদি খরচসমূহ। সংরক্ষণ খরচের বেশির ভাগ অংশই হচ্ছে মজুরী এবং সুদ খরচসমূহ। ২০০২ সালে চট্টগ্রামে ১ মণ চালের গড় মাসিক সংরক্ষণ খরচ ১৪.৪২ টাকা অনুমিত হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালের তুলনায় সংরক্ষন খরচ বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রধানতঃ সুদ ও ভাড়া বৃদ্ধির কারণে (সারণী-১ ও appedix সারণী-৪)

সারণী-১ : চালের গড় মাসিক সংরক্ষণ খরচ

উপাদান	মণ প্রতি মাসিক খরচ (টাকা)
মজুরী	৪.২৭
ভাড়া	১.৮৪
সুদ	৪.৪৭
ক্ষয়ক্ষতি	২.৯৯
পরিবহন ইত্যাদি	০.৮৫
মোট টাকা	১৪.৪২

উৎস ঃ মাঠ জরীপ ২০০২

বিশ্লেষন কাঠামো ঃ দাম গঠনের একটা স্বল্পকালীন নমুনা (model)

মৌসুমি উত্তোলনের পরই শস্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। আমন চাল, যা মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ১৯৮৫), ডিসেম্বর-

জানুয়ারী সময়কালে বাজারে আসে। এক মৌসুমে আগত যোগানকে, যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ ভোগের জন্য একটা বৃহত্তর পরবর্তীকালীন সময় কালের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নের চিত্রে (চিত্র ১) লেফটউইচ এর স্বল্পকালীন দাম প্রক্রিয়ার সরলীকৃত মডেল (Leftwich, 1970 : 201) ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরীকৃত দাম গঠনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র-১ : খোলা বাজারে দাম নির্ধারণ

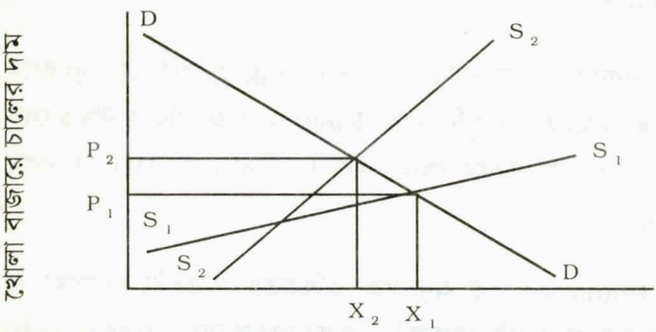

ধরা যাক, যোগান সংগঠিত হওয়ার সময় কালটা এক বছরের চেয়ে কম হয়, (যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে); চিত্রে যোগান রেখা DD, এক মাস সময়কালের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয়েছে যে, একটা সমগ্রক (population) দেয়া থাকলে চাহিদা মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে এবং প্রতিটি এক মাস সময় কালের চাহিদা রেখা, সারা বছরের জন্য অভিন্ন। বিক্রেতারা যে কোন একমাস সময়কালে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রথম সময়কালে প্রস্তাবিত দাম যত বেশি হবে, তারা ঐ সময়ে তত অধিক পরিমাণ চাল বাজারে ছাড়বে বলে প্রত্যাশা করা যায়। প্রথম একমাস সময়কালের যোগানরেখা চিত্রের S_1S_1 রেখার মত ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হবে। এ অবস্থায়, বাজার দাম এবং বিক্রয় এর পরিমান হবে যথাক্রমে P_1 ও X_1।

দ্বিতীয় একমাস সময়কালের যোগান রেখা S_1S_1এর উপরে অবস্থান করবে। কারন, সংরক্ষণের খরচ, অবশিষ্ট দ্রব্যের উপর বিনিয়োগ থেকে মুনাফা প্রাপ্তির

একটা স্বাভাবিক হার এবং দ্রব্য ধরে রাখার ঝুকির ক্ষতিপূরণের অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন পরিমানের জন্য পরবর্তী সময়কালে যথেষ্ট উচ্চতর দামের প্রয়োজন হয়, যা বিক্রেতাদেরকে দ্রব্য ধরে রাখতে প্ররোচিত করে। এভাবে দ্বিতীয় সময়কালের যোগান রেখাটা দাড়ায় চিত্রের S_2S_2 এর মত। এ অবস্থায়, দাম এবং বিক্রয় এর পরিমাণ নির্ধারিত হবে যথাক্রমে P_2এবং X_2। এভাবে পরবর্তী সময়কালে মাসিক যোগান রেখা সমূহের প্রতিটি তার পূর্বের সময়কালের যোগান রেখার উপরে অবস্থান করে।

রেশন এর সরবরাহ, বা সরকারি সরবরাহ (offtake), বাজারকে দুস্বভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমতঃ সরকারি সরবরাহ (offtake) এর বৃদ্ধি স্থানীয় চালের চাহিদা হ্রাস করবে, যা চিত্রের খোলা বাজার চাহিদা রেখা DD কে বামে স্থানান্তরিত করবে।

দ্বিতীয়ত ঃ Bouis এর তত্ত্ব অনুসারে, অধিকতর আমদানী ব্যবসায়ী বা বিক্রেতাদের দিক থেকে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত ফটকা কারবারের কারণে উচ্চতর ঝুকি মূল্য সৃষ্টি করে (Bouis-1983)। তার বিশ্লেষনে Bouis স্বীকার করেন যে, সরকার কর্তৃক আমদানীকৃত খাদ্য শস্যের মাসিক বিতরণ এর ব্যাপারে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকে। এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফটকা করবারের কারণে বিক্রেতাদের উচ্চতর ঝুকির মূল্য অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বিভিন্ন পরিমাণের জন্য স্বাভাবিক দামের চেয়ে উচ্চতর দামের প্রয়োজন হবে। এটা, খোলা বাজারে যোগান রেখা S_1 S_1. S_2S_2 ইত্যাদিকে বামদিকে স্থানান্তরিত করার প্রবণতা সৃষ্টি করবে। উপরোক্ত দু'ধরনের প্রভাবের নীট ফলাফল শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালে এবং পরবর্তী বাজারজাতকরণ মৌসুমের অব্যবহিত পূর্বের সময়কালের বাজার দামসমূহের মধ্যকার পার্থক্যের মাত্রাকে প্রভাবিত করবে। বোরো ধান, যা ক্রমাগত গুরুত্ব অর্জন করছে, উত্তোলনের পর দাম হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু এর পরবর্তী সময় থেকে, প্রধান শস্য আমন এর নতুন উত্তোলনের সময়কাল নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি পেতে থাকবে (Mears and Anden 1972 : 139)

Regression Model

মৌসুমি উত্থান পতন ও দামের বিস্তারের উপর সরকারি মজুদ হতে offtake এবং বেসরকারি ব্যবসায়ীদের প্রাসঙ্গিক আচরণ এবং প্রভাব বিশ্লেষনের জন্য, Bouis এর খাদ্য শস্যের বাজারের সমীক্ষার ভিত্তিতে এবং বউইস এর model ইষৎ পরিবর্তন করে, একটা Regression model ব্যবহার করা হয়েছে (Bouis-1983)। এখানে খাদ্য শস্যের দামের মৌসুমি বৃদ্ধিকে একটা অধীন চালক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সরকারি সরবরাহ (offtake) কে একটি স্বাধীন চলক ও অভ্যন্তরীন উৎপাদনকে অপর একটি স্বাধীন চলক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি সরবরাহ (offtake) কে, অভ্যন্তরীন সংগ্রহ এবং বাহ্যিক সংগ্রহ বা আমদানীর উপর নির্ভরশীর বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দেশের বিভিন্ন অংশে খাদ্যশস্যের সরবরাহের, বিতরণে কোন উল্লেখযোগ্য বিধি নিষেধ বিদ্যমান না থাকার কারণে, সাধারণত সরকারি সরবরাহ (offtake) ও দেশব্যাপী উৎপাদন এবং এগুলোর পরিবর্তনের প্রভাব, চট্টগ্রামসহ দেশের সকল প্রধান এলাকায় দামের মৌসুমি পরিবর্তনকে কম বেশী একইভাবে প্রভাবিত করবে বলে প্রত্যাশিত। তাই, মৌসুমি উত্থান পতনের উপাত্ত চট্টগ্রাম এলাকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে, অরপদিকে সরকারি offtake এবং উৎপাদনের উপাত্ত পুরো দেশের ভিত্তিতেই সংগৃহীত হয়েছে। ইষৎ পরিবর্তিত Regression model টি নিম্নরূপঃ

$P=A+b_1M+b_2Y$

যেখানে,

P= জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে (মাঝারি) চালের দামের বার্ষিক বৃদ্ধি (শতকরা হারে);

M= বার্ষিক সরকারি সরবরাহ (offtake), (লাখ মেট্রিক টনে)

Y= মোট বার্ষিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (লাখ মেট্রিক টনে)

উপাত্তসমূহ ছিল ১৯৭৮ থেকে ১৯৯০ সময়কালের। Multiple linear regression টির ফলাফল নিম্নরূপঃ-

P= ৬১.৮৪+১.১৪৩ M -০.৫৪৯Y

(t-মান) (১.০৪৯) (১.০৪৫) (১.২২৮) R^2 =০.২০৩

M, তথা সরকারি সরবরাহ (offtake) এর সহগ ধনাত্মক এবং এটা সাধারণ প্রত্যাশার বিপরীত। যেহেতু, দামের উপর সরকারি সরবরাহ (offtake) এর একটা সংশোধনমূলক (moderating) প্রভাব থাকা উচিত। এ সহগটা ধনাত্মক হওয়ার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, সরকারি সরবরাহ (offtake) এর তখনই প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয় যখন যোগানের স্বল্পতার দরুন উচ্চ দাম পরিলক্ষিত হয়। এভাবে সরকারি সরবরাহ (offtake) অক্রিয়ভাবে (passively) দামের উত্থান-পতনের উপর নির্ভরশীল হতে পারে, কিন্তু এটা বিপরীতক্রমে সত্য নয়। এ সহগের চিহ্ন এবং এর তাৎপর্য্য বুঝায় যে, সম্ভবত সরকারি যোগান স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্য ভিত্তিক (ad-hoc basis) উন্মুক্ত করা হয়; যেমন-উচ্চ মৌসুমী উত্থান পতন বা উচ্চ দাম বিস্তার সম্পন্ন বছর সমূহে উচ্চতর offtake, এবং নিম্ন মৌসুমী দাম বিস্তার সম্পন্ন বছর সমূহে নিম্ন offtake- যা দামের উপর উপলব্ধি করার মত সামান্যই প্রভাব সৃষ্টি করে। এটাও যোগ করা যেতে পারে যে,সরকারি offtake এর সহগ পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এ ফলাফল একটা পূর্ববর্তী সমীক্ষাকে সমর্থন করে, যেখানে বলা হয়েছিল যে, সরকারি আমদানী দ্বারা দাম প্রভাবিত হয় না (রকিবুজ্জামান এবং আসাদুজ্জামান, ১৯৭২ ঃ ২৯)।

দাম বৃদ্ধির সাথে অভ্যন্তরীন উৎপাদনের আকারের সম্পর্ক বিপরীত, যা প্রত্যাশিত। কারণ; উৎপাদনের পরিমান হ্রাস পেলে দাম বৃদ্ধি পাবে। তবে এর প্রভাব, তেমন একটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

উল্লেখ্য, চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) সময়কালে খাদ্য আমদানী সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যবসায়ীদের জন্যও উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। তবে সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনার মূলনীতি, যেমন দাম স্থিতিশীল রাখা ও দুস্থ্যদের সহায়তা দানের নীতিমালা, অপরিবর্তিত রয়েছে (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,

১৯৯০)। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার কারণে মৌসুমি দাম বিস্তারের উপর সরকারি সরবরাহের (offtake) প্রভাবের কোন পরিবর্তন সূচিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য উপরোক্ত Regression model অনুসারে অপর একটি Multiple linear regression ব্যবহার করা হয়েছে-যার উপাত্তসমূহ ছিল ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৫ সময়কালের। উক্ত linear regression টির ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

P= ২৪.৩৫৩+০.৫৮৭ M-০.১৭১Y

(t-মান) (০.৬৫৩) (০.৭৮৮) (০.৭৭৪) R^2= ০.০৯৯

M বা সরকারি সরবরাহের (offtake) সহগ পূর্ববর্তী ফলাফলের মতই ধনাত্মক এবং পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এ ফলাফল বুঝায় যে, এ সময়েও সরকারি যোগান সম্ভবত স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্য ভিত্তিক (ad-hoc basis) উন্মুক্ত করা হয়েছে যা দামের উপর সামান্যই প্রভাব সৃষ্টি করে। উপরন্ত, ১৯৯০ এর পরে সরকারি সরবরাহ (offtake) এর পরিমাণ পূর্বের সময়ের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে (Appendix: সারণী-৩)। বেসরকারি আমদানীর ফলে এটা প্রত্যাশিত, যদিও বর্ধিত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কারণেও তা হতে পারে। সরকারি সরবরাহের নিম্নমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকলে দাম পরিবর্তনের উপর এর প্রভাব অধিকতর নিষ্ক্রিয় হয়ে দাড়াতে পারে।

এ সময়েও দাম বৃদ্ধির সাথে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় বিপরীত, যা প্রত্যাশিত এবং এর প্রভাব তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। যদি সরকারি অংশগ্রহন, দামের স্থিতিশীলতা আনয়নে সফল না হয়, তবে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দাড়ায় যে, অন্য কোন উপাদান দামের মৌসুমী উত্থান-পতনকে প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে, খোলা বাজারে খাদ্য শস্যের বাণিজ্যের বৃহৎ অংশের জন্য দায়ী বেসরকারি ব্যবসায়ী বা ফটকা কারবারীদের কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত অংশে তা উপস্থাপিত হয়েছে।

বেসরকারী ব্যবসায়ীদের কার্যপ্রণালী

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর ১৯৯৯ এবং ১৯৭৯ সময়কালে ব্যবসায়ীদের কার্যপ্রণালীর

একটা তুলনা, তাদের অবস্থান ও প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা এবং মৌসুমি দামের উত্থান-পতনের উপর তাদের সম্ভাব্য প্রভাবের একটা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সারণী-৩ এ, Mears ও Anden কর্তৃক অনুসৃতঃ পদ্ধতি (Mears & Anden 1972: 139-41) অনুসারে নিরূপিত, ১৯৭৯ ও ১৯৯৯ সালে মধ্যম ও নিম্নমানের চালের মজুদকারী ব্যবসায়ীদের গড় মুনাফার হার তুলনা করা হয়েছে। একটা সমগ্রক (population) প্রদত্ত অবস্থায়, এক বছরের বিভিন্ন মাসে খাদ্য শস্যের চাহিদা একই রকম থাকার কথা। তাই, এক বছরে ব্যবসায়ীদের গড় মানুফার হার প্রাক্কলনের জন্য, শস্য ধরে রাখার মাসিক মুনাফার হারের একটা গড় ব্যবহৃত হয়েছে উল্লেখিত দুই সময়কারের জন্য।

এক বছরের কোন একটা প্রদত্ত মাসের জন্য, মুনাফার হার হবে নিম্নরূপ ঃ-

$$Rmi = \frac{Prm - Pro - Cm}{Pro} \times ১০০$$

এখানে,

Rmi=i বছরে, m মাস পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৭ মাস) চাল ধরে রাখার মুনাফার হার;

Prm=m মাসে চালের খুচরা দাম;

Pro = ভিত্তি মাসে চালের খুচরা দাম (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে);

Cm=m মাস পর্যন্ত চাল ধরে রাখার খরচ। খরচ (Cm) চাল মজুদকরণে মজুদের খরচ ও সুদ খরচের যোগফল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে সুদ খরচ ১৯৭৯ ও ১৯৯৯ সালের জন্য যথাক্রমে ১১ ও ১৫.৫ শতাংশ; ১৯৭৯ সালের চাল রাখার খরচ নির্ণয়ে ১৯৮৬ সালের প্রাক্কলিত মজুদ খরচ ব্যবহার করা হয় এবং ১৯৭৯ সালের মজূরী হার সূচকসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে এ প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা হয়। ১৯৯৯ সালের চাল রাখার খরচ ২০০২ সালের মজুদ খরচের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়।

i =১৯৭৯, ১৯৯৯

i বছরের জন্য-

$$R_i = \frac{\sum_{m=১}^{৭} R_{mi}}{৭}$$

যেখানে Ri =i বছরে মুনাফার হার;

সারণী-২ : ব্যবসায়ীদের গড় মানুফার (বা ক্ষতির) হার

চালের প্রকৃতি	১৯৭৯	১৯৯৯	t-মান
মধ্যম মান	১৭.১৪(৮৬)	-২৩.৯০(৫৭.৬)	৫.৩৭*
নিম্নমান	১০.৯৬(৯০.৬)	-২২.৬০(৬৭.২)	৪.৮৯*

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীতে উপস্থাপিত মানসমূহ সংশ্লিষ্ট coefficient of variation (cv)* 1% level এ তাৎপর্য্যপূর্ণ (Significant)

উৎস ঃ সারণী-১, Appendix : সারণী-২, Appendix : সারণী-8

সারণী-২ বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মধ্যম ও নিম্ন উভয় মানের চালের ক্ষেত্রেই মুনাফার হার হ্রাস পেয়েছে। উভয় ধরনের চালের ক্ষেত্রেই, ১৯৭৯ ও ১৯৯৯ এর গড় মুনাফার হারের মধ্যকার পার্থক্য, পরিসংখ্যানিক দিক থেকে তৎপর্য্যপূর্ণ। মুনাফার এ সকল প্রাক্কলন নির্দেশ করে যে, ব্যবসায়ীরা লাভ করতে পারবে শুধুমাত্র চতুর বাণিজ্যের মাধ্যমে তথা, দামের পরিবর্তন অনুসারে, উচ্চতর দাম সম্পন্ন এবং ভিন্ন মাসে বিক্রয়ের মাধ্যমে। এটাও যুক্ত করা যেতে পারে যে, যে সকল বৃহৎ মিল মালিক ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদনের ফল লাভ করে, খাদ্যশস্য মজুদ এবং এর ব্যবসাও করে থাকে, তাদের খরচ সম্পর্কে এ সমীক্ষায় তদন্ত করা হয়নি বলে এ সমীক্ষায় প্রাক্কলিত হারের চেয়ে প্রকৃত মুনাফার হার

উচ্চতর হওয়া স্বাভাবিক। মুনাফা হ্রাসের কারণ অধ্যয়ন করার জন্য সারণী-৩ এ উপস্থাপিত চালের খুচরা দামের মৌসুমী সূচকের একটি বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

সারণী-৩ : মধ্যম মানের চালের খুচরা মূল্যের মৌসুমি সূচক

মাস	১৯৬০-৬৫	১৯৬৫-৬৮	১৯৮৫-৯০	১৯৯৬-৯৯
জুলাই	১০১.৮৬	১০৪.২১	৯৫.৯৫	৯২.০১
আগষ্ট	৯৭.৯৮	১০৩.৮৯	১০১.১৪	৯২.০২
সেপ্টেম্বর	১০০.৩৪	১০৯.০২	১০৩.০২	৯৪.৪৬
অক্টোবর	১০০.৪৯	১০৪.৮৬	৯৮.৩৭	৯৪.৬৯
নভেম্বর	৯৭.৬৮	১০০.৬৯	১০০.৪১	৯৪.৬৪
ডিসেম্বর	৯২.৯৯	৯২.৩৫	৯৭.৫৪	৯৪.৫৮
জানুয়ারী	৯২.৮৮	৯২.৬৬	৯৭.২১	১১৮.৭৬
ফেব্রুয়ারী	৯৬.২৩	৯৩.৯৬	৯৯.২৭	১২০.৮৪
মার্চ	৯৮.৯৭	৯৩.০০	১০০.৪০	১০০.৮৯
এপ্রিল	১০৩.৩৫	৯৬.৮৫	১০২.৬১	১০০.১৭
মে	১০৫.৮৬	১০১.৬৬	১০২.৫	১০০.০৫
জুন	১১১.১১	১০৬.৭৮	১০১.৫৬	৯৫.০৫

উৎস ঃ Appendix সারণী ১ ও ২

সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন মাসের মধ্যে শতকরা মানসমুহের পরিবর্তন ১৯৬০-৬৫ সময়কালে ১৮.২৩, ১৯৬৫-৬৮ সময়কালে ১৬.৬৭, ১৯৮৫-৯০ সময়কালে ৭.০৭ এবং ১৯৯৬-৯৯ সময়কালে ২৮.৮৩। এটা দেখায় যে, দামের মৌসুমী বিস্তারে মাত্রা বিবেচ্য বছরসমূহে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। BIDS এর একটা সমীক্ষা থেকেও এ ফলাফলসমূহের সমর্থন পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে, চালের পাইকারী দামের মৌসুমি বিস্তারসমূহের মাত্রা, ১৯৭০ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে (Chowdhury ১৯৮৭ঃ১১৪)।

পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় ১৯৯৬-৯৯ সময়কালে দামের মৌসুমি বিস্তৃতি বৃদ্ধির একটা উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে শস্য উত্তোলনের সময় জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে দাম রেখার নিম্নভাগ বা তলের ব্যাপক উত্থান এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে জুলাই-আগষ্ট মাসে দাম রেখার চূড়া (peak) কাঠামোর হ্রাস (সারণী-৩)।

সরকারের অভ্যন্তরীন সংগ্রহ কর্মসূচি দামের এ মৌসুমি পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। চালের দামে মৌসুমীত্ব এবং অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ-এ দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে চৌধুরী কর্তৃক পরিচালিত BIDS-এর একটা সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এই সমীক্ষা অনুযায়ী চাল ও ধানের একটা বৃহৎ অংশ ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী সময়কালের মধ্যে, তথা আমন শস্য আহরণের সংশ্লিষ্ট সময়কালের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছিল। সমীক্ষার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, শস্য উত্তোলনজনিত দামের হ্রাস স্থগিত করণের মাধ্যমে "সংগ্রহ কর্মসূচী" খাদ্য শস্যের মৌসুমী দামের তল (trough) উন্নয়নে অবদান রেখেছে (Chowdhury; 1987 : 114-27)।

ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম পরীক্ষা করলে ১৯৯৬ পরবর্তীকালে শস্য উত্তোলনের সময় মৌসুমী দামের উত্থানে তাদের সম্ভাব্য প্রভাবও প্রকাশ পায়। ১৯৮০ থেকে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অংশে প্রায় ২০০ বড় চালের মিল গড়ে উঠে। এ সমীক্ষায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাঠ জরিপ হতে প্রতীয়মান হয় যে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সব মিলের প্রতিনিধিরা উন্নত ধান উৎপাদনকারী প্রধান এলাকাসমূহে যাতায়াত করে এবং সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে বা, স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে এ সব মিলে সরবরাহ করে। প্রতি মিল কর্তৃক বার্ষিক প্রক্রিয়াজাতকৃত ধানের গড় পরিমাণ ২৫০০ টন থেকে ২০,০০০ টনের মধ্যে উঠানামা করে (BRRI, 1987 : 83, 162)। এক প্রাক্কলন অনুসারে কৃষি উৎপাদনের প্রায় ২৫ শতাংশ হচ্ছে চালের বাজারজাতকৃত উদ্ধৃত্ত (BRRI, 1987 : 12, 54)। যা নির্দেশ করে, ১৯৯৯ এর জন্য বাজারজাতকৃত উদ্বৃত্ত প্রায় ৫১ লাখ মেট্রিক টনের কাছাকাছি। এর অর্থ, চালের বাজারজাতকৃত উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ এ সকল মিলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, যেগুলো খাদ্যশস্যের মজুদ ও বাণিজ্যও করে থাকে। যখন তারা কোন একটা দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার একটা বড় অংশ গঠন করে তখন ব্যবসায়ী বা ফটকা কারবারীগণ, অন্যান্য ফটকা কারবারীগণের পদক্ষেপ সম্পর্কিত সচেতনতা নিয়েই ক্রয় করে থাকে (Weiss, 1967 : 52)।

অন্য ফটকা কারবারীরা ক্রয় করবে মনে করে যখন ফটকা কারবারীরা ক্রয় করে তখন কোন কোন সময় দাম বাড়াতে পারে, এবং এভাবে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে শস্য উত্তোলনের সময়কালে দাম রেখার তল এর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটে থাকে। অন্য সময়ে, বিক্রয় সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত একই ধরনের আচরণ দামের পতন ঘটাতে পারে, যেভাবে শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বের সময়কালে দাম রেখার চূড়া ব্যাপক হ্রাস ঘটাতে পারে। বাণিজ্যকারকদের উক্ত আচরণকে ১৯৯৬-৯৯ সময়ে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে শতকরা মানসমূহ সর্বোচ্চ ও অপরদিকে জুলাই-আগষ্ট মাসে সর্বনিম্ন থাকার একটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

এ ব্যাপারটা আংশিকভাবে উপরোক্ত BIDS সমীক্ষায় উপস্থাপিত হয়েছে যেখানে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, মিলের যান্ত্রিকায়িতক্ষমতার বিকেন্দ্রীভূত অবস্থান দাম রেখার তল (belly) উন্নয়নে অবদান রেখেছে (Chowdhury; 1987:125)। বোরো ধান, যা ক্রমাগত গুরুত্ব অর্জন করছে, উত্তোলনের পর অর্থাৎ জুন-জুলাই মাসে দাম হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। ১৯৯৫-৯৬ সালে বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭২.২ লক্ষ মেঃ টন-যা এসময়ে মোট উৎপাদনের প্রায় ৪১ শতাংশ। বোরো ধানের উৎপাদনকে ১৯৯৬ পরবর্তী সময়ে জুন-জুলাই মাসে চুড়া কাঠামোর ব্যাপক হ্রাস ও দামের পতন এর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

সংরক্ষনের খরচ, বিনিয়োগ থেকে মুনাফা প্রাপ্তির একটি স্বাভাবিক হার এবং ঝুঁকির ক্ষতিপুরন মিটানোর জন্য উত্তোলনের পরবর্তী ধারাবাহিক সময়কালে যথেষ্ট উচ্চ দামের প্রয়োজন হয়। যা ব্যবসায়ীদের উত্তোলনের সময়ের পর শস্য ধরে রাখতে প্ররোচিত করে। ১৯৯৬ থেকে মূল্য সূচক এর গতিবিধি ও বর্তমান ধরণ নির্দেশ করে যে এর বিপরীতটাই হয়েছে। শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে উচ্চ মূল্য বিরাজ করে। অতঃপর মূল্য বৃদ্ধি না পেয়ে বরঞ্চ হ্রাস পেতে থাকে এবং শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বের সময়কালে অর্থাৎ জুলাই-আগষ্ট মাসে উচ্চ দামের পরিবর্তে দাম নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায় (সারণী-৩)। মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায়, মজুদ ও ঝুঁকি খরচ না মেটানোর ফলে মুনাফা ঋনাত্মক হয়। ব্যবসায়ীগন লাভ করতে পারবে

শুধুমাত্র চতুর বাণিজ্যের মাধ্যমে তথা, উচ্চতর-দাম সম্পন্ন এবং ভিন্ন মাসে বিক্রয়ের মাধ্যমে।

ফলাফল ও উপসংহার

এ সমীক্ষায় খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চাল, বিতরণ ব্যবস্থার-বিশেষ করে চট্টগ্রাম এলাকার-বিভিন্ন উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে করে বাজার দামসমূহ কী উপায়ে মৌসুমিভাবে গঠিত ও পরিবর্তিতত হয় এবং সরকারী মজুদ হতে offtake ও ব্যবসায়ীদের কার্যপ্রণালী কিভাবে দামের গঠন ও পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে তা বুঝা যায়। সমীক্ষায় চট্টগ্রাম এলাকার পাইকারী দোকান ও গুদামসমূহের ক্ষেত্রে চালের গড় মাসিক মজুদ খরচ হিসেব করা হয়েছে।

উৎপাদন ও দামের মৌসুমিত্ব বিবেচনায় এ সমীক্ষায় খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান যেমন একদিকে বাজার দাম ও তার মৌসুমি পরিবর্তন এবং অন্যদিকে উৎপাদন, সরকারী সরবরাহ (offtake), ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা ইত্যাদির আন্তঃ সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের জন্য Leftwich (1970) কর্তৃক প্রণীত একটা সরল নমুনা (model) ব্যবহার করা হয়েছে। এ নমুনা ব্যবহারের মাধ্যমে, শস্য আহরণের সময়ের অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালে এবং পর্যায়ক্রমিক মাসিক সময় ব্যাপ্তিকালে খোলা বাজারে দামের গঠন পরীক্ষা করা হয়েছে।

সরকারি সরবরাহ (offtake) সহ বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য একটা regression model ব্যবহৃত হয়েছে। যা থেকে দেখা যায় যে, আন্তঃ মৌসুমী দাম পরিবর্তনের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের কোন তাৎপর্যপূর্ণ, স্থিতিশীলতা আনয়নকারী প্রভাব নেই। এ ফলাফল পূর্বের একটা BIDS সমীক্ষা সমর্থন করে, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, আমদানী দাম পরিবর্তনে নিষ্ক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়ে দামের উত্থান-পতনের উপর তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রভাব রাখতে ব্যর্থ হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৯৭৯ ও ১৯৯৯ সময়কালের মধ্যে, ব্যবসায়ীগণ যারা মজুদ ও বাণিজ্য করে-এর মুনাফার হার হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। এ হ্রাসকৃত এবং ঋণাত্বক মুনাফার হারের কারণ হিসেবে মৌসুমী দাম বিস্তৃতির ধরণকে চিহ্নিত করা হয়েছে-যা মুলত শস্য উত্তোলনের সময় মৌসুমী দাম রেখার তলের উল্লেখযোগ্য উত্থান দ্বারা প্রভাবিত।

এ সমীক্ষায় উপস্থাপিত প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে ১৯৯০ এর পর খাদ্য আমদানী বেসরকারি ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করার ফলে দামের বিস্তৃতির উপর সরকারি অংশগ্রহনের প্রভাবের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়নি। তবে সরকারের অভ্যন্তরীন সংগ্রহ কর্মসূচী শস্য উত্তোলন জনিত দামের হ্রাস স্থগিত করণের মাধ্যমে ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী সময়কালে খাদ্য শস্যের মৌসুমি দামের তল উন্নয়নে অবদান রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ সমীক্ষা সরকারী অংশগ্রহন ছাড়া অন্যান উপাদানের দিকেও নির্দেশ করে যেগুলো মৌসুমি দামের উত্থান-পতনকে প্রভাবিত করতে পারে। এ সমীক্ষা অনুসারে, ১৯৮০ এর শেষ নাগাদ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক প্রধান চালের মিল গড়ে উঠেছে এবং এটা নির্দেশ করে যে, চালের বাজারজাতকৃত উদ্ধৃত্তের একটা বড় অংশ এ সকল মিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ দিক থেকে, এ সমীক্ষায়, প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের কার্যপ্রণালীর একটা পরীক্ষার মাধ্যমে, শস্য উত্তোলনের সময়কালে এবং উচ্চতম দাম মাস সহ বছরের অন্যান্য সময়কালে, দামের মৌসুমি তারতম্যের উপর বৃহৎ মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাবের সম্ভাবনাকে তুল ধরে।

১৯৯৬ থেকে শস্য উত্তোলনের অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালে মৌসুমী দাম রেখার তলের (belly) ব্যাপক উত্থান ঘটেছে। উত্থান আবার ঘটেছে মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচী (Internal procurement program) এবং সম্ভবত ১৯৮০ পর্যন্ত গড়ে উঠা বড় মাত্রার মিলিং (milling) ক্ষমতার কারণে। অপরদিকে বোরো ধানের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ১৯৯৬ পরবর্তী সময় জুন-জুলাই মাসে চুড়া কাঠামোর হ্রাস এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। ১৯৯৬-৯৯ সময়ে দাম বিস্তৃতির এ ধরণের কারণে মূল্য ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় ব্যবসায়ীদের মজুদ খরচ ও ঝুঁকি খরচ মেটানো যায়নি, যার ফলে মুনাফা ঋনাত্মক হয়। ব্যবসায়ীকগন লাভ করতে পারবে শুধুমাত্র চতুর বাণিজ্যের মাধ্যমে তথা, উচ্চতর দাম সম্পন্ন এবং ভিন্ন মাসে বিক্রয়ের মাধ্যমে।

এটা প্রস্তাব করা যায় যে,বৃহৎ মিল মালিকদের খরচ ও মুনাফা, এবং ক্রয়, বা প্রত্যাহারের এবং মিল মালিকসহ ব্যবসায়ীদের বিক্রয় আচরণ এর উপর সমীক্ষা

পরিচালনা করা যেতে পারে। এর ফলে তাদের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতার একটা সঠিক পর্যালোচনা এবং মৌসুমী দাম উত্থান পতনের উপর তাদের সম্ভাব্য প্রভাবের একটা অধিকতর সঠিক মূল্যায়ন লাভ করা যায় । এছাড়া ১৯৯০ এর পরবর্তী সময়কালে বেসরকারী আমদানীকারকদের আমদানী ও বিক্রয় আচরণের উপর বিস্তারিত নিরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, যাতে করে মৌসুমী দামের উপর সরকারের পাশাপাশি তাদের সম্ভাব্য প্রভাবও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯১) ***ইকনমিক ট্রেন্ডস*** / ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯২) ***ইকনমিক ট্রেন্ডস*** / ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৪) ***ইকনমিক ট্রেন্ডস*** / ঢাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯৯) ***ইকনমিক ট্রেন্ডস*** / ঢাকা।

বি, বি, এস (১৯৮৬) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৮৭) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯১) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯২) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯৩) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯৪) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৯৬)) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (২০০১) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (১৯৮৩) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন*** / ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি, বি, এস (২০০১) ***মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন***। ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বি আর আর হাই (১৯৮৭) ***বাংলাদেশে চালের বাজারজাত করণের একটা বেঞ্চমার্ক সমীক্ষা*** / ঢাকা ঃ বি আর আর আই।

বউইস, এইচ, ই (১৯৮৩) ***'ফিলিপাইনে চালের মৌসুমি দামের তারতম্য; সরকারি হস্তক্ষেপের প্রভাব পরিমাপ*** / খাদ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমীক্ষা Vol. xxx, No. 1

চৌধুরী, নঈমউদ্দিন (১৯৮৭) ***স্বাধীনতার সময়কাল থেকে বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের দাম ও সংগ্রহ কর্মসূচীর মৌসুমিত্বঃ একটা উদঘাটনমূলক সমীক্ষা,*** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, Vol. X. বি আই ডি এস।ঃ

বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৩), *চালের গড় মাসিক খুচরা দাম*। চট্টগ্রাম ঃ কৃষি বিপনন অধিদপ্তর।

পূর্ব পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরো। *মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন* (বিভিন্ন সংখ্যা)। ঢাকা।

হামিদ এম, এ, (১৯৯১) *এ ডাটা বেস ইন এগ্রিকালচার এন্ড ফুডগ্রেন ইন বাংলাদেশ,* ঢাকা।

লেফটউইচ, আর (১৯৭০), *দ্যা প্রাইস সিস্টেম অ্যান্ড রিসোর্স অ্যালোকেশন ইলিনয়েসঃ*দ্যা ড্রাইডেন প্রেস।

মেয়ারস, লিওন এ এবং এগ্রেন, টি, এল, (১৯৭২) *শষ্য উত্তোলন পরবর্তী চালে দামের বৃদ্ধি থেকে কে লাভবান হয়? দক্ষিণ পূর্ব এশীয় সমীক্ষা* (সাউথ ইষ্ট এশিয়ান ষ্টাডিজ)।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৮০) *ডেভেলপমেন্ট স্টাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ।*ঢাকা ঃ কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৫) *তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক* পরিকল্পনা। ঢাকা ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

রকিবউজ্জামান এবং আসাদউজ্জামান এম (১৯৭২) ***১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সময়কালে বাংলাদেশের চালের দামের বিশ্লেষন ।*** নতুন সিরিজ নং-২। ঢাকা ঃ বি আই ডি এস।

ওয়েইস, এল, ডব্লিও (১৯৬৭), *কেস স্টাডিজ ইন আমেরিকান ইন্ডাষ্ট্রি ।*ইউ, এস, এ ঃ উইলি এন্ড সন্স।

APPENDIX

সারণী-১ চালের (মাঝারি) মাসিক নূন্যতম গড় খুচরা মূল্য

মাস	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮
জুলাই	২৫.০৩	২৪.৯৯	২৭.৩৫	২৮.৫৯	২৮.০০	৩৬.৪০	৪৫.২০	৪৮.৪০
আগষ্ট	২৫.৯৬	২৪.৬১	২৫.৩৯	২৫.৬০	২৭.২০	৩৬.৪০	৪৭.২০	৪৬.০০
সেপ্টেম্বর	২৫.০৩	২৫.১৯	২৫.৭৪	২৫.৫১	৩০.৪০	৩৭.২০	৫২.৪০	৪৬.৪০
অক্টোবর	২৩.০৬	২৫.৮৬	২৬.৪০	২৫.৯২	৩০.৮০	৩৫.২০	৪৯.৬০	৪৬.০০
নভেম্বর	২১.৯৮	২৫.১২	২৬.৩৬	২৪.৮৮	৩০.০০	৩৫.২০	৪৬.৫০	৪৩.৬০
ডিসেম্বর	২১.৯৭	২৩.৬৮	২৫.৩৯	২২.৩৮	২৮.৮০	৩৩.২০	৪২.৪০	৩৯.৬০
জানুয়ারী	২৩.১৪	২৩.৭৪	২৫.৮০	২২.১৮	২৭.২০	৩৪.৪০	৪২.৮০	৩৮.৪০
ফেব্রুয়ারী	২৩.৮৪	২৪.২২	২৭.০১	২১.৭৬	২৯.৬০	৩৩.২০	৪৬.৪০	৩৭.৬০
মার্চ	২৪.৩০	২৫.৪৬	২৮.৪৬	২১.৪৪	৩০.৪০	৩৪.৪০	৪৪.৮০	৩৬.৮০
এপ্রিল	২৪.৮৬	২৬.৫৭	২৮.৭৬	২৪.৪০	৩১.২০	৩৭.৬০	৪৪.৮০	৩৮.৪০
মে	২৫.৩৫	২৭.২৩	২৮.৯৪	২৫.২০	৩২.৪০	৩৯.২০	৪৭.২০	৪০.৪০
জুন	২৬.১৫	২৮.০৫	২৯.৮১	২৭.২০	৩৪.৮০	৩৯.৬০	৪৭.৬০	৪৬.০০

উৎস ঃ ১। খাদ্য বিভাগ, পূর্ব পাকিস্তান সরকাশ, ২। পূর্ব পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরো। মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, (বিভিন্ন সংখ্যা)

APPENDIX

সারণী-২ চট্টগ্রামে চালে মাসিক গড় খুচরা মূল্য (কেজি প্রতি টাকায়)

বৎসর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১৯৭৮	মাঝারি ৩.৫৭	-	-	৪.৬০	৪.৯৪	৫.১৪	৪.৩৪	৪.১৬	-	৪.৪২	-	৪.৫১
১৯৭৮	নিম্ন ৩.৩৫	৩.৭৩	৪.১১	৪.৩৫	৪.৩৭	৩.৯৩	৩.৮৫	-	-	-	-	-
১৯৭৯	মাঝারি ৪.৪৬	৪.৬৪	৪.৭৭	৫.১৮	-	৬.০৫	৬.৮৭	৬.৮১	৭.২২	৬.৭৮	-	-
১৯৮০	মাঝারি ৬.৩০	-	-	৬.৫৫	৬.৬৯	৬.৬০	৫.৭৩	৬.০১	৬.১৫	৬.০৮	-	-
১৯৮১	মাঝারি ৫.০৮	৫.২৪	৫.২৪	-	-	-	-	৬.৫৪	৬.৪৬	৬.৮৫	-	-
১৯৮২	মাঝারি ৭.২৯	৮.১৯	৮.১৯	-	-	-	-	৭.৫৪	৯.৩৪	৯.২৯	-	-
১৯৮৩	মাঝারি ৭.৭৬	৭.৫৫	৭.৪৯	-	-	-	-	৮.১৯	৮.৫৬	৯.৩০	-	-
১৯৮৪	মাঝারি ৮.৫৬	৮.১৩	৯.১৯	৯.৬৫	-	-	-	১০.৩৮	১০.১৭	১০.১৭	-	-
১৯৮৫	মাঝারি ৮.৬০	৮.৮১	৮.৮৭	৮.৮৭	৮.৩৭	৭.৭৫	৭.৭৫	৯.২১	৯.২১	৯.০২	৯.০২	৯.০০
১৯৮৬	মাঝারি ৯.২৭	১০.১৮	৯.৫৭	১০.১৬	১০.৬৪	১০.৬৫	১০.৯৬	১০.৬৩	১০.৪৭	১১.০১	১১.৫৯	১১.২৫
১৯৮৭	মাঝারি ১১.১০	১১.১৯	১১.৫৬	১২.৩০	১২.১৫	১১.২১	১১.৫৫	১৩.৮১	১৩.৭৫	১৩.৫৬	১২.৩৭	১১.৫০
১৯৮৮	মাঝারি ১২.১২	১২.৫০	১২.৬৭	১২.৫৬	১২.৩১	১২.৬০	১২.৪৯	১২.৫৯	১৩.৪৩	১২.৪৩	১৩.৯০	১৪.২৫
১৯৮৯	মাঝারি ১২.৩৭	১২.২৫	১২.২০	১২.১৬	১২.২২	১২.৪১	১৩.৮৭	১৩.৪৪	১২.৯৩	১২.০৩	১২.৪৫	১১.৫৬

সারণী-২ (১)

বৎসর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১৯৯০	মাঝারি ১২.৫০	১২.৪৬	১৩.২৫	১৩.৩৭	১৩.১৭	১৩.০৬	১৩.২৫	১৩.৮৫	১৪.০০	১৪.০০	১৩.৩১	১২.৭৫
১৯৯১	মাঝারি ১১.৫৮	১২.৫৫	১২.১০	১২.২০	১৪.২৫	১৪.৪০	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৬৯	১৫.০৫	১৩.৯১	১৩.৮০
১৯৯২	মাঝারি ১৪.২৫	১৪.৩০	১৪.৬০	১৫.০০	১৪.৩২	১৫.২১	১৫.০৩	১৪.৭৩	১৪.৭৩	৩.৭৫	১৩.১২	১২.৪০
১৯৯৩	মাঝারি ১২.৫০	১২.২৫	১২.০০	১২.২৫	১২.২৫	১২.২৫	১২.২৫	১২.২৫	১২.৩১	১২.৫০	১২.৫৩	১২.২১
১৯৯৪	মাঝারি ১২.২২	১৩.০৫	১৩.৪৮	১৩.৯৬	১৩.৫৩	১৪.০০	১৪.৭৫	১৫.১৩	১৫.৪৫	১৫.৬২	১৫.৯৪	১৩.০০
১৯৯৫	মাঝারি ১৬.৩৮	১৬.০০	১৬.২৫	১৬.০০	১৬.০০	১৫.৭৫	১৬.০৭	১৬.১৩	১৫.৭৫	১৫.৭৫	১৫.৭৫	১৫.৫০
১৯৯৫	নিম্ন-১৩.৭৫	১৩.০০	১৪.০৫	১৪.০০	১৪.৭৫	১৪.৬৮	১৪.৬২	১৪.৬০	-	-	-	-
১৯৯৬	মাঝারি ১৬.১২	১৬.৫০	১৬.৮৮	১৭.০০	১৬.৫০	১৩.৩৬	১৩.৩৬	১৩.৩৬	১৩.৩৬	১৩.৭০	১৩.৫০	১৩.৪০
১৯৯৭	মাঝারি ২৭.০০	২৭.৫০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৭০	১৫.৫০	১৫.৮০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০
১৯৯৮	মাঝারি ১৬.১৩	১৬.৮৮	১৬.৮৮	১৭.৭৫	১৬.৫০	১৬.৫০	১৬.৮৮	১৮.৭৫	১৯.২৫	১৯.৬০	১৯.৭৫	১৯.৮০
১৯৯৯	মাঝারি ২০৫০	২০.০০	২০.০০	১৮.৫৩	১৯.৫০	১৯.০০	১৫.৭৫	১৬.৯৬	১৬.৩৩	১৬.৩৩	১৬.৩৩	১৬.৩৩
১৯৯৯	নিম্ন ১৭.০০	১৭.৫০	১৭.৬৬	১৬.৪০	১৬.৪২	১৭.০০	১৩.৭৫	১৪.৩০	১৫.০০	-	-	-

উৎস ঃ ১। কৃষি বিপনন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম, ২। বিবিএস, মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন (বিভিন্ন সংখ্যা), ৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, ইকনমিক ট্রেন্ডস (বিভিন্ন সংখ্যা) ঢাকা।

সারণী-৩ : অভ্যন্তরীন উৎপাদন এবং সরকারি মজুদ হতে **offtake**

বৎসর	উৎপাদন (লাখ মেট্রিক টন)	**off-Take** (লাখ মেট্রিক টন)
১৯৭৮	১১৫.৫২৩	১৬.৬৭
১৯৭৯	১০৯.৪০৩	২৩.৩৬
১৯৮০	১১৬.৫৯৯	১৭.৮৭
১৯৮১	১৩৬.২৫৯	১৭.৮২
১৯৮২	১২২.১৫৭	২১.৪২
১৯৮৩	১৩০.৪৬৯	১৭.৯২
১৯৮৪	১২৮.৭২৫	২৭.১৮
১৯৮৫	১৩৩.৫৫৭	১৭.৩০
১৯৮৬	১৩৮.৩২৩	১৭.৩৫
১৯৮৭	১৩৮.৪৯৭	২৬.১৮
১৯৮৮	১৩৫.৮৬১	২৩.৫১
১৯৮৯	১৩৩.৬৬	২৬.২৯
১৯৯০	১৫৪.৭০	২১.৭০
১৯৯১	১৫৫.৭১	২৬.০৬
১৯৯২	১৫৪.০৬	১৫.২৮
১৯৯৩	১৫৪.০৬	১১.৯০
১৯৯৪	১৬২.৬৯	১৪.৪২
১৯৯৫	১৫০.৮৩	১৬.৯৩

দ্রষ্টব্য ঃ বাৎসরিক উৎপাদন যা অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ এবং ডিসেম্বর এ আমন ধানের ভোগের পরিমাণ দ্বারা সংশোধিত।

উৎস ঃ ১। ইয়ার বুক অফ এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ (বিভিন্ন সংখ্যা)। ঢাকা ঃ বিবিএস।

২। পরিসংখ্যান ইয়ার বুক (বিভিন্ন সংখ্যা)। ঢাকা ঃ বিবিএস।

৩। ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ এগ্রিকালচার, ১৯৮০। কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়।

৪। এমএ হামিদ (১৯৯১), ডাটা বেস ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুডগ্রেইন ইন বাংলাদেশ। ঢাকা।

৫। মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন (বিভিন্ন সংখ্যা)। ঢাকা ঃ বিবিএস।

সারণী-৪ ঃ চালে গড় মাসিক সংরক্ষণ খরচ

উপাদান	মাসিক খরচ (মনপ্রতি)
মজুরী	টাকা ৩.২৬
ভাড়া	০.৩৩
সুদ	০.৭১
ক্ষয়ক্ষতি	০.০২
হ্যান্ডলিং, ইত্যাদি	৪.৩২
মোট টাকা	৮.৬৪

উৎস ঃ মাঠ জরীপ ১৯৮৫-৮৬

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

প্রকল্প চক্র ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন প্রক্রিয়া

এস, জে, আনোয়ার জাহিদ *

Project Cycle and Environmental Impact Assessment Process

- S. J. Anowar Zahid

Abstract : Environment basically refers to the natural and human surroundings, which is made up of personal, interpersonal, institutional and cultural components of human life that influence our development and behaviour. In many developing countries, the environment has been getting polluted over the years due to unplanned development activities, rapid industrialization, urbanization and misuse of natural resources. Moreover, in selecting development projects, significant environmental impacts are not systematically assessed as a regular process like financial, economical, and social appraisal. To make the development sustainable, environment should be taken into account in all technical planning and decision-making process along with the financial, economic and social studies and needs to be integrated with the project cycle. To give an overall picture for decision-making, it is necessary to consider the environmental impacts together with technical and financial data. In cases where uncertainty can be converted into risk, sensitivity analysis can be done in selecting suitable project through Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), and Benefit Cost Ratio (BCR) considering adverse environmental impacts and it's cost. Stockholders or public participation can be ensured in different stages of project cycle. All these will accelerate better environmental protection and ensure sustainable development of the country.

---

* উপ-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা।

ভূমিকা

প্রাকৃতিক ও সামাজিক এ দু'ধরনের পরিবেশের মধ্যে আমরা বসবাস করছি। মূলত ভূ-সম্পদ (মাটি, পানি, আলো, বায়ু, খনিজ পদার্থ), তাপমাত্রা, গাছ-পালা ও প্রাণি ইত্যাদি নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত। মানুষ উন্নত জীবন যাপনের জন্য পানি, মাটি,বায়ু, খনিজ পদার্থ গাছপালা প্রভৃতি প্রতি নিয়ত অতি মাত্রায় ব্যবহারসহ অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ তথা অবকাঠামো নির্মাণ, শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন করে চলেছে। অপরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা গড়ে উঠার ফলে, বর্জ্য নিষ্কাশন/পরিশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় বা অপর্যাপ্ত হওয়ায় পরিবেশ দুষিত হচ্ছে[১]। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমুহে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অধিকাংশই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সাধারণত প্রকল্প আকারে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূ-সম্পদ ও গাছপালার মাত্রাতিরিক্ত বা অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর তা সৃষ্টি করছে বায়ু , মাটি, পানি ও শব্দ দূষণসহ নানাবিধ সমস্যা। উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে এর দ্বারা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে কিনা তা নিরূপন করার প্রয়োজন হয়।

টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনের নিমিত্তে কেবমলমাত্র এর আর্থিক, অর্থনৈতিক, কারিগরী ও পরিচালন বিষয়ক সম্ভাব্যতা যাচাই (feasibility study) করাই যথেষ্ট নয়। সম্ভাব্য প্রকল্প বা বিকল্পসমূহ মানুষ বা প্রানির স্বাস্থ্য বা প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক কিনা এবং সামাজিক রীতিনীতির উপর প্রভাব সৃষ্টি করবে কিনা তা বিবেচনা পূর্বক সর্বোৎকৃষ্ট প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরী এবং পরিবেশের দৃষ্টিকোন থেকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য প্রকল্প নির্বাচনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessmen) করার প্রয়োজন হয়। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বলতে সাধারণত কোন কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে উদ্ভুত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ফলাফলসমূহকে ধারাবাহিকভাবে বিশদ

পরীক্ষা করাকে বুঝায়। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক জীবনে উদ্ভুত সম্ভাব্য ধণাত্বক ও ঋণাত্বক পরিবর্তনসমূহ নিরূপণ করা হয়[২]। প্রস্তাবিত প্রকল্পে পরিবেশের বিরূপ কোন প্রভাব থাকলে তা'দুরীকরণের জন্য বিকল্প পন্থাসমুহের আলোকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ করতে হয়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার এবং উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন ও ব্যবহারের উপর পরিবেশের বিরূপ প্রভাব সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ নির্ভরশীল। প্রযুক্তির সাথে পরিবেশের প্রভাবের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র থাকায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদের যথার্থ ব্যবহার ও প্রকল্পের প্রযুক্তি নির্বাচন বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়।

পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্র

পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বিষয়টি প্রকল্পের ধরণ, আকার ও অবস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল বিধায় প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য বিবেচনাপূর্বক পরিবেশগত প্রভাব মুল্যায়ন করতে হয়। সাধারণত সম্ভাব্য প্রকল্পগুলোর উপর প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (Initial Environmental Examination) পরিচালনা এবং প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবেশগত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য জানা যায়। এছাড়া, সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব বিবরণী (Envirmental Impact Statement) হতে প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাকৃতিক, জৈবিক, সামাজিক ও অর্থনীতির উপর পরিবেশগত প্রভাবের বর্ণনা জানা যায়, যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। মূলত, কোন দেশের বিদ্যমান সাধারণ ও পরিবেশগত নীতিমালা (policies) নির্দেশিকা (guidelines) এবং প্রক্রিয়াকরণ নিয়মকানুন (processing procedures) অনুসরণপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হয়। প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এবং অনুমোদনের নিমিত্তে প্রকল্পকে প্রধানত কতগুলো শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। বিশ্ব ব্যাংক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন প্রকল্পকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত করে থাকে[৩]:

১. ক শ্রেণী ঃ যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় বা অন্যত্র তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে, সেগুলোর ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ

২. খ শ্রেণী ঃ যে সকল প্রকল্পের প্রকল্প এলাকায় সম্ভাবনাময় পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তেমন প্রভাব ফেলবে না, এমন প্রকল্পের ক্ষেত্রে আংশিক পরিবেশগত বিশ্লেষণ এবং এর জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

৩. গ শ্রেণী ঃ যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বা তেনম কোন বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি হবে না, সেগুলোর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ অনাবশ্যক।

প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন ধাপে পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ পদ্ধতি

উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পগুলো যথাযথ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় এবং এর জন্য কতগুলো যৌক্তিক ধাপ অনুসরণ করতে হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে এ ধাপগুলো হলোঃ প্রকল্প সম্বন্ধে ধারণা লাভ ও প্রকল্প সনাক্তকরণ, প্রকল্প ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণ (project desing and preparation), প্রকল্পের মূল্য নিরূপণ (project appraisal), প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান (project implementation & supervision), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (monitoring and evaluation)। প্রকল্পের এ কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে আবর্তিত হয় বিধায় তাকে প্রকল্প চক্র (project cycle) বলা হয়। লাভজনক কোন প্রকল্প নির্বাচন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য বিকল্প প্রকল্পের পরিবেশগত ধণাত্বক ও ঋণাত্মক প্রভাবসমুহ প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন ধাপে বিবেচনা ও নিরূপণ করার প্রয়োজন হয়। নিম্নে প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন ধাপে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের বিবেচ্য বিষয় ও পারস্পরিক সম্পর্ক রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শনপূর্বক সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

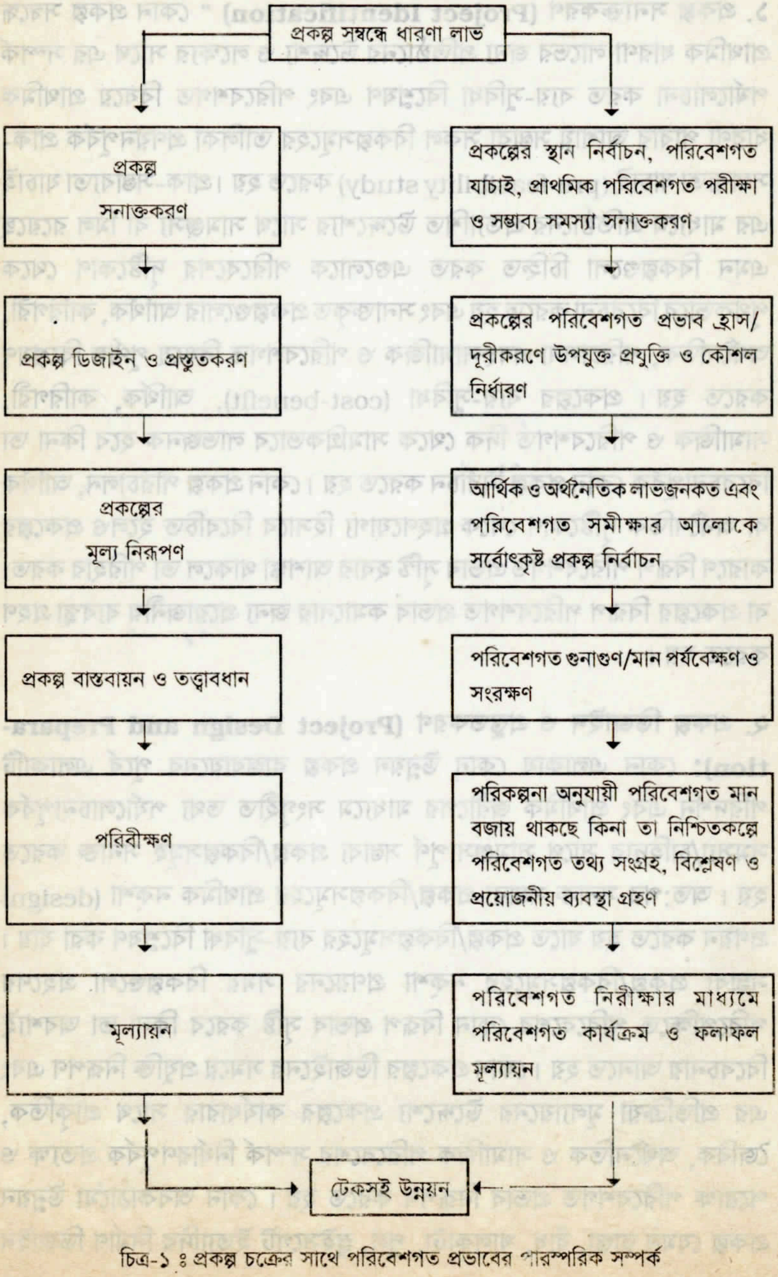

চিত্র-১ ঃ প্রকল্প চক্রের সাথে পরিবেশগত প্রভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক

১. প্রকল্প সনাক্তকরণ (Project Identification) " কোন প্রকল্প সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে এর সম্পর্ক পর্যালোচনা করত ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ এবং পরিবেশগত বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পাবার আশায় সম্ভাব্য সকল বিকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নপূর্বক প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই (pre-feasibility study) করতে হয়। প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বা মিল রয়েছে এমন বিকল্পগুলো চিহ্নিত করত এগুলোকে পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হয় এবং সনাক্তকৃত প্রকল্পগুলোর আর্থিক, কারিগরী, অর্থনৈতিক, পরিচালনা এবং সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রকল্পের ব্যয়-সুবিধা (cost-benefit), আর্থিক, কারিগরী, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থেকে সামগ্রিকভাবে লাভজনক হবে কিনা তা বিবেচনাপূর্বক কোন প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়। কোন প্রকল্প পরিচালন, আর্থিক বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হলেও প্রকল্পের কারণে বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি হবার আশঙ্কা থাকলে তা পরিহার করত: বা প্রকল্পের বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

২. প্রকল্প ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণ (Project Design and Preparation): কোন এলাকায় কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকাটি পরিদর্শন এবং প্রাথমিক জরীপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক সমস্যা/চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্ভাব্য প্রকল্প/বিকল্পসমূহ সনাক্ত করতে হয়। অত:পর সনাক্ত সম্ভাব্য প্রকল্প/বিকল্পসমূহের প্রাথমিক নক্‌শা (design) প্রণয়ন করতে হয় যাতে প্রকল্প/বিকল্পসমূহের ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ করা যায়। সম্ভাব্য প্রকল্প/বিকল্পসমূহের নক্‌শা প্রণয়নের সময় বিকল্পগুলো গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশের কোন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে কিনা তা অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হয়। কোন প্রকল্পের ডিজাইনের সময়ে প্রযুক্তি নিরূপণ এবং এর প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের কার্যধারার সাথে প্রাকৃতিক, জৈবিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ক নির্ধারণপূর্বক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করতে হয়। কোন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প যেমন রাস্তা, বাঁধ, খালকাটা, পুল, স্লুইসগেট ইত্যাদির নির্মাণ ডিজাইন

প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাঠামোর অবস্থান, সুফল সৃষ্টি ও পরিবেশগত প্রভাব বিষয়ে এলাকার জনগণের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়।

গ্রামীণ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের দৃষ্টিকোণে লাগসই প্রযুক্তি (appropriate technology) ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। কারিগরী বিষয়ক দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রযুক্তি নির্বাচিত হওয়া বাঞ্চনীয় যাতে প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও এর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্পের কারিগরী দিক সনাতণী ও উন্নত প্রযুক্তির সংমিশ্রণে বাস্তবায়িত হতে পারে। কারিগরী বিষয়ক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। মূলত সনাক্ত সম্ভাব্য বিকল্প/প্রকল্পগুলো প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপর কিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তা নিরূপণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রযুক্তি সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির তুলনামূলক রূপরেখা অংকন করত পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন সামঞ্জস্য ও টেকসই কোন প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়। প্রয়োজনে প্রকল্পের বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব কমানো বা প্রকল্প গ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন ব্যাক্তিবর্গ বা পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হয়।

৩. প্রকল্পের মূল্য নিরূপণ **(Project Appraisal)** ঃ প্রকল্পের মূল্য নিরূপণ পর্যায়ে সনাক্ত বিকল্প/প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত কারিগরী, অর্থনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়সমুহ বিশ্লেষণ করা হয় এবং তুলনামুলকভাবে সর্বাধিক লাভজনক বা গ্রহণযোগ্য কোন প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত প্রকল্পের ধরণ, আকার ও অবস্থান ইত্যাদি বিষয় এবং সনাক্ত প্রকল্প সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ও প্রাথমিক ধারণার উপর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ব্যাপকতা নির্ভরশীল। সনাক্ত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অর্জনে কি পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। প্রয়োজনে পরিবেশগত ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত সম্পদের বরাদ্দ নিশ্চিতকরণসহ ব্যবস্থাপনাগত নমণীয়তার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকায়

জরীপ পরিচালনা বা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যাদি লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রযোজ্য প্রকল্পের সুফলসৃষ্টি, ঝুঁকি ও পরিবেশগত দৃষ্টিকোণে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্ধারণপূর্বক সম্পদের যুক্তিগ্রাহ্য বিভাজন করতে হয়।

পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের জন্য উন্নত বিশ্বে শতাধিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমুহে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে আটটি কৌশল ও পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে[৪], যথাঃ ১. অ্যাড হক (Ad hoc), ২. যাচাই তালিকা (Check lists), ৩, ছাঁচ (Matrices), ৪, জালাকার (Networks), ৫. উপরিপাত (Overlays), ৬. উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশ সূচক (Environmental Index Using Factor Analysis), ৭. ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ (Cost-Benefit Analysis), ৮. অনুকরণ নকশায়ন কর্মশালা (Simulation Modeling Workshops)। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেগ্রহণযোগ্য কোন উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিকল্পসমূহের তুলনামূলক ফলাফল নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিবেশগত প্রভাবের মাত্রা উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ পদ্ধতি যাতে সহজভাবে পরিচালিত হতে পারে, বিশেষ করে লোকবল, অর্থ, সময় বা বিশেষজ্ঞ মনোনয়নে বা প্রযুক্তি ব্যবহারের খরচ যাতে অংশীভূত সংস্থার সামর্থের বাইরে না যায়, তার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন হয়[৫]।

টেকসই ও লাভজনক প্রকল্প নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য বিকল্প/প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এবং পরিবেশ দুষণ কমানোর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন, বাস্তবায়ন কর্মকৌশর নির্ধারণসহ প্রকল্পের আর্থিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করতে হয়। মূলত বিবেচ্য প্রকল্পের অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক বিষয়ের সাথে কারিগরী ও পরিবেশগত বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়। নিম্নে প্রকল্পের অর্থনৈতিক, আর্থিক ও কারিগরী বিষয়ের সাথে পরিবেশগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ (Economic and Financial Analysis)

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিকল্প/প্রকল্পটি আয় অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য কিনা তা বিবেচনা করতে হয়। কোন প্রকল্প কার্যক্রমের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন, উন্নয়ন ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে যে ভূমিকা রাখবে, সে দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জন করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে লাভজনক প্রকল্প নির্বাচনে তেমন সহায়ক নয় বিধায় ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের অর্থনৈতিক ও আর্থিক লাভজনকতা নির্ণয় বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে করা যায়। তন্মদ্ধে অভ্যন্তরীণ উপার্জন হার পদ্ধতি (Internal Rate of Return Method), বর্তমান মূল্য পদ্ধতি (Present Value Method), সুবিধা-ব্যয় অনুপাত (Benefits-Cost Ratio) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুবিধা-ব্যয় অনুপাতকে আবার সুবিধা-ব্যয় বিশ্লেষণ হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। নিম্নে প্রকল্পের লাভজনকতা নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ পরিবেশগত বিশ্লেষণের আলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ (Cost-Benefit Analysis):

ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষনের মাধ্যমে কোন বিকল্প/প্রকল্পের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কি পরিমাণ আয় হবে বা সুবিধা পাওয়া যাবে তণ্মদ্ধে তুলনামুলক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় এবং সুবিধাকে অর্থের বর্তমান মূল্যে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের ব্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যয়, পুণ:স্থাপন/মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, চলতি ব্যয় ও পরিবেশগত ব্যয় ইত্যাদির সমষ্টিকে বুঝানো হয়ে থাকে। অপরদিকে সুবিধা বলতে প্রকল্পের উৎপাদিত দ্রব্য/সেবা হতে প্রাপ্য আয়, পরিবেশ কর/ফি, সম্পদ বিক্রয়ের আয়কে বুঝানো হয়ে থাকে। প্রকল্পের ব্যয়-সুবিধা সনাতনী পদ্ধতি বা অর্থের বর্তমান মূল্যে বিবেচনায় বের করা যায়। প্রকল্পের ব্যয়ের সাথে আয়ের সম্পর্কে সাধারনত

অনুপাতের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। প্রকল্পের মোট সুবিধাকে (B=Benefits) এবং মোট ব্যয়কে (C=Cost) হিসেবে গণ্য করত: এর ফলাফল B/C>1 হলে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং B/C<1 হলে প্রকল্পটি বর্জন করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের ব্যয়-সুবিধাকে অর্থের বর্তমান মূল্যে শতকরা হারেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যার জন্য ইহা ব্যয়-সুবিধা অনুপাত নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। এ ব্যয়-সুবিধা অনুপাতকে নিম্নোক্তভাবে বের করা যায় ঃ

$$\text{Benefits-Cost Ration (BCR)} = \frac{\text{Total Present Value of Cash Inflows}}{\text{Total Present Value of Cash Outflows}} \times 100$$

প্রকল্পের ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, পরিবেশগত প্রভাব রোধকরণের জন্য স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যয় নিরূপণ বা উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্ধারণ এবং প্রাপ্য সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করত: লাভজনক প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়। মূলত প্রকল্পের ব্যয়-সুবিধা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিষয় বিবেচনা ও বিশ্লেষণ পূর্বক কোন উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়।

বর্তমান মূল্য পদ্ধতি (Present Value Method)

এ পদ্ধতিতে কোন সম্ভাব্য বিকল্প/প্রকল্পের সকল প্রকার মূলধনী ও পরিচালন ব্যয় এবং সম্ভাব্য আয়কে অর্থের বর্তমান মূল্যে বিবেচনাপূর্বক তথা বাট্টাকৃত মূল্যে প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য (Net Present Value বা NPV) বের করা হয়। বাট্টাকৃত মূল্য হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন সময়ের সংগঠিতব্য ব্যয় ও প্রাপ্য আয়ের মধ্যে তুলনা করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে কোন সম্ভাব্য বিকল্প/প্রকল্পগুলোর বাট্টাকৃত নীট বর্তমান মূল্য র‍্যাঙ্কিং করত তুলনামুলকভাবে অধিক লাভজনক প্রকল্প নির্বাচন করা হয়। কোন প্রকল্পের বর্তমান মূল্যকৃত ব্যয় (present value of cash outflows) অপেক্ষা বর্তমান

মূল্যকৃত আয় (present value of cash inflows) বেশি হলে তা'গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে কোন প্রকল্পের উৎপাদক রাশি (discount factor) বা বর্তমান মূল্য বের করা যায়[৬]।

$$PV = \frac{Cf}{(1+r)^n}$$

যেখানে,

PV = Present Value (বর্তমান মূল্য)

Cf = Cash flows (অর্থের প্রবাহ)

r = rate of interest (সুদের হার)

n = number of year (বৎসরের সংখ্যা)

উপরোক্ত পদ্ধতিতে অর্থের বর্তমান মূল্য বের করার সময় পরিবেশ সম্মত প্রকল্প নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব দুরীকরণমূলক ব্যয় বিবেচনায় আনতে হয়। পরিবেশগত ব্যয় বিবেচনায় কোন প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য ধনাত্মক হলে তাগ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একাধিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে যে প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য সর্বাধিক সে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

অভ্যন্তরীণ উপার্জন হার পদ্ধতি (Internal Rate of Return Method)

এ পদ্ধতিতে কোন প্রকল্প নির্বাচনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য বিকল্প/প্রল্পগুলোর জন্য একটি স্বতন্ত্র উপার্জন হার বের করা হয়। আভ্যন্তীণ উপার্জন হার বলতে প্রকল্পের এমন একটি বাট্রার হারকে বুঝায় যে বিন্দুতে প্রত্যেকটি প্রকল্পের অর্থের বর্তমান মূল্যে মোট অর্থের আগমন এবং মোট অর্থের নির্গমন (total cash inflows and total cash outflows) সমান বা শূণ্য হবে। অন্তক্ষেপ (interpolation)

পদ্ধতি ব্যবহার করে এর ভিত্তিতে প্রতিটি প্রকল্পের স্বতন্ত্র উপার্জন হার বের করতে হয়।

কোন একক প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্ণীত উপার্জন হার পরিমিত উপার্জন হারের অধিক হলে প্রকল্পটিকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার একাধিক প্রকল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ উপার্জন হার বেশি সে প্রকল্পটি সর্বাধিক লাভজনক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অর্থের বর্তমান মূল্যে প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য নিরূপণের ন্যায় পরিবেশের বিরূপ প্রভাব দুরীকরণের ব্যয় বিবেচনায় আনতে হয়। প্রকল্পের পরিবেশগত বিষয় বিবেচনায় যে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ উপার্জন হার পরিমিত উপার্জন হারের অধিক বা তুলনামূলকভাবে বেশি সে প্রকল্পটিকে সর্বাধিক লাভজনক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পরিবেশগত প্রভাবের দৃষ্টিকোণে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণীত ফলাফল বিশ্লেষণ পূর্বক লাভজনক ও টেকসই কোন প্রকল্প নির্বাচন করতে হয়। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত সূচক ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রকল্পগুলোর মধ্য হতে পরিবেশ সম্মত এবং আর্থিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কোন প্রকল্প নির্বাচন করা যেতে পারেঃ

পরিবেশগত বিবরণী ও আর্থিক সূচক

বিকল্প/প্রকল্প	পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া	পরিবেশগত NPV	পরিবেশগত IRR	পরিবেশগত BCR
ক				
খ				
গ				

পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (EIA and Risk Analysis)

প্রতিটি উন্নয়নমূলক বা কারিগরী প্রকল্পেই বিবিধ লক্ষ্য অর্জনে-তথা খরচ, গুনাগুণ ও পরিবেশগত মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সম্মুক্ষীণ হবার সম্ভাবনা থাকে। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও ঝুঁকি নিরূপণ সমান্তরালভাবে উদ্ভব হতে পারে এবং আবার কখনও যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণে একটি অপরটির সম্পর্কযুক্ত হিসাবে দেখা দিতে পারে। কোন প্রকল্প নির্বাচনের পূর্বে ঝুঁকির উৎসসমূহ সনাক্তকরণ, প্রভাব নিরূপণ (ঝুকি বিশ্লেষণ) ও ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। প্রকল্পের আর্থিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য নাজুকতা বিশ্লেষণ (Sensitivity Analysis), সম্ভাবনা বিশ্লেষণ (Probability Analysis), সিদ্ধান্ত বৃক্ষ বিশ্লেষণ (Decision Tree Analysis) ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোন প্রকল্পের ঝুঁকি ও অনিশ্চিয়তা পরিমাপের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত কৌশলটি হলো নাজুকতা বিশ্লেষণ[৭]। নাজুকতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন প্রকল্পের প্রভাব সৃষ্টিকারী বিভিন্ন শক্তির বিরূপ প্রতিক্রিয়া, এর উপযোগিতা এবং লাভজনকতা কতটুকু কমে যেতে পারে বা এর বাস্তবায়নযোগ্যতা কতটুকু ক্ষুন্ন হবে কিংবা টিকে থাকবে তা মুল্যায়ণ করা হয়[৮]। মুলত নাজুকতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পের পরিবেশগত ও অন্য কোন চলক বা উপাদানের পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের আভ্যন্তরীন উপার্জন হার (IRR), নীট বর্তমান মূল্য (NPV) ইত্যাদিতে যে পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা থাকে তা সাধারণত রেখা চিত্রের সাহায্যে প্রদর্শনপূর্বক পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব রোধকল্পে বা সম্ভাব্য ঝুঁকির বিবেচনায় প্রত্যাশিত NPV এবং IRR এর প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হবে কিনা তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের কারণে সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রেক্ষিতে মোট সুবিধার হ্রাস-বৃদ্ধিতে প্রকল্পের পরিবেশগত অভ্যন্তরীন উপার্জন হারকে প্রভাবিত করতে পারে যা নিম্নোক্ত তালিকায় দেখানো হলো।

মোট ব্যয় ও সুবিধার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের পরিবেশগত অভ্যন্তরীণ উপার্জন হারের প্রভাব (শতকরা হারে)

	মোট সুবিধার পরিবর্তন	-১০%	-২০%	-৫০%
মোট ব্যয়ের পরিবর্তন	১৫.২৩	১৩.৮৬	১২.৪০	৭.৪৩
+১০%	১৩.৯৮	১২.৬৮	১১.৩১	৬.৫৪
+ ২০%	১২.৯০	১১.৬৬	১০.৩৪	৫.৭৫
+ ৫০%	১০.৩৪	৯.২৩	৮.০৫	৩.৮৭

Source: Munasinghe, Mohan (Ed.) (1993), Environmental Economics and Natural Resource Management in Developing Countries, Committee of International Development (CIDIE), The World Bank, Washington, P. 62.

প্রকল্প বাস্তবায়ন (Project Implementation)

প্রকল্প চক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পকে কার্যকরণ। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ যোগান, লোকবল নিয়োগ, বিভিন্ন সম্পদ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/বিক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, সেবা সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হয়। এ পর্যায়ে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নকশা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা তাও নিশ্চিত হতে হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপনাধীন অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হয় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সুফলভোগী/সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়। মূলত প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কৌশলের উপরই এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নির্ভরশীল।

কোন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বিবরণী ও প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়াসমূহ বাস্তবায়ন পর্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

সনাক্ত পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব বাস্তবে কতটুকু হ্রাস বা দূর করা সম্ভব হচ্ছে এ পর্যায়ে তা নির্ণয়/পর্যালোচনা করতে সহায়তা করে। কোন ক্ষেত্রে প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তা' উন্নয়নে বিকল্প কোন ধরণের পরিবেশগত কৌশল অবলম্বন করা সঙ্গত হবে তা নির্ধারণ ও ব্যবস্থা গ্রহণে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

পরিবীক্ষণ (Monitoring)

কোন প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন হয়। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির ফলাফলের ভিত্তিতে সময়োচিত সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণাত্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা কাঠামো সৃষ্টি এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) প্রবর্তন করা যেতে পারে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিবেশগত গুনাগুণ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব পরিবীক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। সম্ভাব্য প্রকল্পগুলোর বিরূপ পরিবেশগত প্রভাবের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে পরিবীক্ষণ হাতিয়ার নির্ধারণ ও তা প্রয়োগ করা যেতে পারে[২৮]। যে সকল ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণের জন্য ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না-সে সকল ক্ষেত্রে পরিবেশগত নির্ণায়ক হিসেবে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে কোন বিশেষ স্থানের তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব এড়ানোর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন, বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দুরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

প্রকল্প চক্রের সর্বশেষ ধাপ হলো মুল্যায়ন। এ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রমসমুহ কতটুকু দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়েছে এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য কি পরিমাণ

অর্জিত হয়েছে তা নিরূপণপূর্বক পর্যালোচনা করা হয়। এ পর্যায়ে প্রকল্পের পরিবেশগত দিক পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের সাথে মূল্যায়ণ করে দেখা হয়। পরিবেশগত নিরীক্ষা প্রকল্পের পরিবেশগত অবস্থা, ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও পরিবেশগত ব্যয় ইত্যাদি পর্যালোচনা করে থাকে যা অপচয় রোধ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আধুনীকিকরণের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। পরিবেশগত নিরীক্ষা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশগত আইন প্রতিপালন বিষয়েও মূল্যায়ন করে থাকে।

প্রকল্প চক্রের এ ধাপে পরিবেশগত নিরীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিবেশগত নিরীক্ষার সময়, পদ্ধতি এবং নিরীক্ষা সম্পাদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। নিরীক্ষাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের পরিবেশগত বর্তমান অবস্থা, সংরক্ষিত তথ্যাদি/রিপোর্ট ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। মূলত পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রকল্পের অনাকাঙ্খিত প্রভাব নিরূপণসহ বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস/দুরীকরণ এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প নক্শায় পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে [১০]।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত প্রবাব নিরূপণ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা সমাধান তথা সুষ্ঠ পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়। অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে ১৯৯২ খ্রি: সালে পরিবেশ নীতিমালা প্রণয়ন এবং ১৯৯৫ খ্রি: সালে ইউ এন ডি পি-এর আর্থিক সহযোগিতায় National Environmental Management Action Plan প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশের বৃহদাকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে গৃহীত হওয়ায় প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বিষয়টি প্রায়ই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা সম্ভব হয় না। অবশ্য সরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প সারপত্র (Project Concept Paper)'তে প্রস্তাবিত প্রকল্প হতে

বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি হবে কিনা সে মর্মে মতামত প্রদান করতে হয়। প্রকল্প থেকে পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি হলে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু কোন কোন ধরণের সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বাধ্যতামুলক সে সম্পর্কে বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বাধ্যতামুলককরাসহ প্রস্তাবিত প্রকল্প বা শিল্প কলকারখানার পরিবেশগত বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে না।

পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ডিজাইনে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিতকরণপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে তা' অনুসৃত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে সময়োচিত তত্ত্বাবধান করা যেতে পারে। বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি সরকারি ও বেসরকারি উভয়ের উপর নির্ভরশীল বিধায় কোন পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগ বা ব্যক্তিগত মালিকানায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যুকরণের প্রবর্তিত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে। এমনকি পূর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দুষণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাওগ্রহণ করা যেতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিশদ শ্রেণীবিন্যাস করত উচ্চ হারে পরিবেশ ফি বা কর আরোপসহ প্রণীত আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে আইনের সংশোধন করা যেতে পারে।

প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন ধাপে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সুফলভোগী ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়া, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তথা stakeholders এর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ইতিবাচক ভুমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার

পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন প্রকল্পের সারপত্র এবং প্রকল্প ছকে পরিবেশগত বিষয় বিস্তারিত সন্নিবেশন বা পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রকল্প চক্রের সকল ধাপে পরিবেশগত প্রভাব বিষয়টি বিবেচনা নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করত টেকসই প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। অবশ্য পরিকল্পনা কমিশন ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার জন্য এর ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করণসহ প্রয়োজনীয় নীতিমালা নির্ধারণ ও তা অনুসরণ নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন রয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং প্রকল্প সনাক্তকরণে ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণের ভূমিকা পালন করলেই টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. মিয়া গোলাম রসুল এবং ওহাব, এম, এ (২০০০), *মাধ্যমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প,* শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃঃ ২৮৭।

২. ইমাম, কাজী হাসান (১৯৯৬), *উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ,* লোক প্রশাসন সাময়িকী, ৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রিঃ।

৩. The World Bank (1997), ***The Impact of Environmental Assessment : A Review of World Bank Experience, World Bank Technical paper No. 363,*** Washington, D. C, P.2.

৪. ESCAP (1990), ***Environmental Impact Assessment : Guidelines for Water Resources Development, ESCAP-Environment and Development Series,*** United Nations, New York, p.20.

৫. ইসলাম, এম আমিনুল (১৯৯৮), *সম্পদ ব্যবস্থাপনা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৭৫।

৬. জাহিদ, এস, জে, আনোয়ার (১৯৯৮), *পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপক, উপ-ব্যবস্থাপক এবং সহকারী ব্যবস্থাপকদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স নির্দেশিকা,* পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃঃ ১০১।

৭. জাহিদ, এস, জে, আনোয়ার (১৯৯২), *উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন এবং বাস্তবায়নে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা,* বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ষাম্মাসিক পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, জানুয়ারী ১৯৯২।

৮. চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল মান্নান এবং চৌধুরী, তৌহিদুল করিম (১৯৮৫), ***উচ্চতর কৃষি অর্থনীতি,*** আবীর পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম, পৃঃ ৮৬।

৯. Lee, N (1989), ***Environmental Impact Assessment : A Training Guide,*** ELA Center, Department of Planning and Landscape, University of Manchester, U. K, p. 84.

১০. Sadler, B (1990), ***The Evaluation of Assessment : Post-EIS Research and Process Development,*** in Weather, peter (Ed.), ***Environmental Impact Assessment : Theory and Practice,*** Unwind Hymen, London, p. 132.

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

সামাজিক গবেষণায় প্রতিবেদন লিখন ঃ পদ্ধতি ও কৌশল

রহমত আলী-ছিদ্দিকী *

Abstract : The method and technique of writing a research report in social research are very significant. In this article the methods and techniques of writing a research report have been discussed systematically. At the very beginning of the article, some light has been flashed on considering the factor for writing a research report. Essential sections generally included in a perfect social research report and their characteristics have been elaborated critically in this article. Later on characteristics of a perfect research report have been discussed And some recommendations have been put-up at the end of the article in order to ensure the proper shape of social research report.

ভূমিকা

বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ তাঁদের জীবনের নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। উদ্দেশ্যানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিবেদন বিভিন্ন লক্ষ্যে প্রণীত হয় বিধায় উপস্থাপনা ও কাঠামোর দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। একজন সংবাদিক সংঘটিত কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে তা প্রতিবেদন আকারে সংবাদপত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন, কোন পুলিশ অফিসার কোন ঘটনার তদন্ত করে তার রিপোর্ট পেশ করে থাকেন এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা প্রতি অর্থবছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন লেখার পদ্ধতি এক রকম

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

নয় এবং তা সব সময় সবার জন্য লেখা হয় না। বিশেষ বিশেষ প্রতিবেদনের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরণের পাঠক নির্ধারিত থাকে। তাই প্রতিবেদন লেখার সময় সেই বিশেষ পাঠকের উপযোগী করে তা তৈরী করা হয়। তবে একথা সত্য যে, সব প্রতিবেদনেরই উদ্দেশ্য হ'ল তথ্য প্রকাশ করা[১]। সংগৃহীত তথ্য এবং লেখকের স্বীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রনে এই প্রতিবেদন একটি বিশেষ সৃষ্টিতে পরিনত হয়। তাই নতুন জ্ঞান ও তত্ত্ব প্রকাশ করার পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

গবেষক তাঁর গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাপক অনুসন্ধান পরিচালনার পর সংগৃহীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরীর কাজে মনোযোগ দেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেদন তৈরীর কাজটি তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রত্যাশিত ও আনন্দদায়ক। দীর্ঘ দিন যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় শেষে তিনি যা লাভ করেন তা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে চান প্রতিবেদনরূপে। কোন গবেষণার ফলাফল যত মূল্যবানই হোক না কেন, তা সংশ্লিষ্ট পাঠকের সামনে যথার্থরূপে তুলে ধরতে না পারলে কেউই তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং নতুন জ্ঞান হিসেবে তা স্বীকৃতি লাভ করে না বা জ্ঞানের প্রসার সম্ভব হয় না। প্রতিবেদন হচ্ছে গবেষণার সর্বশেষ ধাপ যার মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত আগ্রহী পাঠকবৃন্দের কাছে এসে পৌঁছে, প্রতিবেদনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। নতুন সৃষ্টির আনন্দ জড়িত থাকলেও প্রতিবেদন তৈরীর কাজটি কিন্তু একেবারেই সহজসাধ্য নয়। সংশ্লিষ্ট পাঠকবৃন্দের উপযোগী করে একটি যথার্থ প্রতিবেদন লিখতে যথেষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের দরকার হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই বিষয়ে পরিচালিত অনুসন্ধানের উপর তৈরীকৃত প্রতিবেদন গবেষকভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে[২]। কোনটি পাঠক মনে আবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়; আবার কোনটি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেদন লিখন একটি কলা বিশেষ। তাই একই ঘটনার উপর পরিচালিত অনুসন্ধানের প্রতিবেদন গবেষকভেদে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতিবেদনের উপর্যুক্ত বিষয়কে বিবেচনায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধটিতে নিম্নোক্ত বিষয়যমূহ সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে ঃ

ক. সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিবেদনের স্বকীয় ধরণ নিরূপণ

খ. গবেষণা প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ষমূহ চিহ্নিতকরণ

গ. উত্তম প্রতিবেদনের মৌলিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ

ঘ. গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো বিশ্লেষণ এবং

ঙ. যথার্থ প্রতিবেদনের স্বরূপ নিরূপণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রনয়ণ।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি সম্পূর্ণরূপে একটি তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক কর্মের ফসল। তাই সংগত কারনেই এটি মাধ্যমিক (Secondary) অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে লেখকের স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং দেশের বরেণ্য সমাজ গবেষকদের সাথে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য এখানে সংযোজিত হয়েছে। তাই বলা যায় মাধ্যমিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি কিঞ্চিৎ হলেও প্রাথমিক (Primary) অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। মূলতঃ এটি একটি Desk Research, যাকে গবেষণা পদ্ধতির দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) হিসেবেও আখ্যায়িত করা চলে।

প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

গবেষণা প্রতিবেদন তৈরীর ক্ষেত্রে যে বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক নজর দিতে হবে তা হ'ল প্রতিবেদনটি কোন শ্রেণীর ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে লিখিত হবে। যদি প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট পেশাজিবী বা গবেষকদের জন্য লেখা হয় তাবে তা যে অবয়বে হবে, সর্বসাধারণের জন্য লেখলে তা অবশ্যই ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করবে। অর্থাৎ প্রতিবেদনের ধরণ তার পাঠক দ্বারা নিশ্চিত হয়। তবে একথা সত্য যে, প্রতিবেদন সাধারণ মানুষের জন্যই লেখা হোক বা বিশেষ জনসমষ্টির জন্যই লেখা হোক, তা লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় দুম্বটির প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকতে হবে৩ঃ

- কি তথ্যাবলী পরিবেশন করা প্রয়োজন?
- কিভাবে তার সর্বাধিক উত্তম পরিবেশনা নিশ্চিত করা যায়?

প্রতিবেদনের ধরন

উদ্দেশ্য দ্বারা প্রতিবেদন দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যের উপরই প্রতিবেদনের প্রকৃতি নির্ভরশীল। সব প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য পাঠকবৃন্দের নিকট তথ্য সরবরাহ করা হ'লেও গবেষণার প্রতিবেদন আর পুলিশ অফিসার বা সাংবাদিকের প্রতিবেদন কোনক্রমেই এক নয়। কারণ তারা নিজস্ব উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন। উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ ও প্রকৃতির দিক বিচারে প্রতিবেদনকে নিম্নলিখিত দু'ভাগে ভাগ করা যায়[৪]ঃ

- তথ্যমূলক প্রতিবেদন (এতে ঘটনার বর্ণনা ছাড়া বিশ্লেষণ, তাৎপর্য ব্যাখ্যা, সুপারিশমালা ইত্যাদি নাও থাকতে পারে)।
- গবেষণার প্রতিবেদন (এতে তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সুপারিশমালা থাকে-যার সাহায্যে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভবপর হয়)।

এ প্রবন্ধে গবেষণা প্রতিবেদনই মূখ্য আলোচ্য বিষয়। গবেষণা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ও পদ্ধতিগত রূপ। সংগৃহীত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের পর গবেষক তাঁর গবেষণার ফলাফল পাঠকের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পন্থায় তা প্রতিবেদন আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাই গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়সমূহের মধ্যে 'প্রতিবেদন লিখন' পর্যায়টি বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। কারণ প্রতিবেদনের লক্ষ্য হ'ল বিস্তারিত তথ্য সংক্ষিপ্ত ফলাফল আকারে এমন সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করা-যাতে পাঠকবৃন্দ গবেষকের কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই উপস্থাপিত তথ্যসমূহ এবং গবেষণার ফলাফলের তাৎপর্য ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে[৫]।

প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় প্রতিবেদনটির পাঠক কারা হবেন সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

রাখতে হবে। কারণ গবেষণা প্রতিবেদন বিশেষ এক শ্রেনীর পাঠকের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় যেখানে পাঠকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মননশীলতা, আগ্রহ ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অতি যত্নসহকারে বিবেচনায় রাখা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যানুযায়ী প্রতিবেদন সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়ে থাকে[৬]। যেমন ঃ

ক. বিশদ বা বিস্তৃত প্রতিবেদন (যেমন, থিসিস)

খ. মাঝারি আকারের প্রতিবেদন (যেমন, কোন জার্নালে প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৈরীকৃত গবেষণামূলক প্রবন্ধ) এবং

গ. সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (যেমন, গবেষণার সার সংকলন)

প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

কোন সামাজিক গবেষণা পরিচালনা শেষে তার একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রতিবেদন লেখার জন্য তেমন কোন সুনির্দিষ্ট ও ধরাবাঁধা রীতি প্রচলিত নেই। গবেষণার উদ্দেশ্য ভেদে এর লিখন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণতঃ একটি গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে[৭] ঃ

ক. গবেষণা সমীক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান এবং তাত্ত্বিক গবেষণার সম্পর্ক বিশ্লেষণ

খ. গবেষণা নকশা ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল বর্ণনা

গ. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা

ঘ. তথ্যের উৎসসমূহ উল্লেখ করা

ঙ. গবেষণার বিষয়-পরিধি (Scope) নিরূপণ

চ. গবেষণার কার্যকর উপপ্রমেয় (Hypothesis) সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান

ছ. গবেষণায় ব্যবহৃত কলাকৌশল ও পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা প্রদান

জ. সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন

ঝ. উপপ্রমেয় যাচাইয়ের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা

ঞ. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপসংহার টানা এবং প্রায়োগিক তাৎপর্য নির্দেশ করা

ট. বিশেষ মন্তব্য প্রদান এবং

ঠ. পরিশিষ্ট (নমুনা, প্রশ্নমালা, নমুনা সাক্ষাৎকার প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে) প্রদান।

সমাজ বিজ্ঞানী মার্গারেট স্টাসি (Margaret Stacy, 1979)-এর মতানুসারে গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিতঃ

- কোন্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে কে বা কারা গবেষণাটি পরিচালনা করছেন তার বর্ণনা গবেষণায় উল্লেখ করা
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা
- গবেষণার শুরু ও সমাপ্তি কালের উল্লেখ করা
- জনগোষ্ঠীর বৃত্তান্ত, নমুনা আকার এবং নমুনায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট বর্ণনা সন্নিবেশিত করা
- গবেষণা পরিচালক, সহকারী ও মাঠ কর্মীদের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা
- তথ্য সংগ্রহের কলাকৌশল ও উপকরনাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
- গবেষণার ফলাফল কি হ'ল তার বিবরণ
- উপপ্রমেয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ ও অসংঘতিপূর্ণ তথ্যাবলীল বিবরণ
- গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অনুরূপ অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক নির্ণয় এবং
- গবেষণালব্ধ ফলাফলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক তাৎপর্যের বিশ্লেষণ।

প্রতিবেদন লিখন পদ্ধতি নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরাও একমত হতে পারেননি। এতেই প্রমানিত হয় প্রতিবেদন লিখন একটি অত্যন্ত জটিল ও বেশ শক্ত কাজ। তবে উপরোল্লিখিত বিষয়ষমূহ অনুসরণ করে প্রতিবেদন তৈরী করলে তা একটি যথার্থ প্রতিবেদনের রূপ ধারণ করবে বলে আশা করা যায়। এখানে আরো

উল্লেখ্য একটি যথার্থ প্রতিবেদন লিখনের ক্ষেত্রে একজন গবেষকের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপূণ্যের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উত্তম প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যাবলী

হ্যান্‌স রাজ (Hans Raj, 1979)-এর মতানুসারে একটি মানসম্পন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত মৌলিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা বাঞ্চনীয়ঃ

(ক) স্পষ্ট চিন্তা

গবেষক দ্ব্যর্থহীনভাবে ও পরিস্কার ভাষায় তাঁর অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান প্রতিবেদনে উপস্থাপন করবেন, যাতে আগ্রহী পাঠকবৃন্দের পক্ষে বক্তব্য বুঝতে কোন প্রকার অসুবিধা বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে না হয়। গবেষণার ফলাফলে মৌলিকত্ব থাকতে হবে। মৌলিকত্বের অভাবে গবেষণা জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে ব্যর্থ হয়[৮]। অপরপক্ষে নতুন তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত গবেষণা ফলাফল জ্ঞানের জগতে নতুন মাত্রা সংযোজন করে।

(খ) স্বচ্ছ ধারণা ও পদ

গবেষণা প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ধারণা ও পদসমূহ সুস্পষ্ট হতে হবে। ব্যবহৃত ধারণা ও পদসমূহ দ্ব্যর্থহীন করার জন্য যথার্থ সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সুস্পষ্ট করতে হবে যাতে বিশেষ অর্থে ব্যবহার ছাড়া কেউ অন্য কোন অর্থে তাদেরকে ব্যবহার করার সুযোগ না পায়। সমগ্র প্রতিবেদনের যেখানেই উক্ত ধারণা বা পদাবলী ব্যবহৃত হবে সেখানেই সংজ্ঞার সাথে সংগতি রেখে তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। সংজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্যই হলো গবেষক কি বিশেষ অর্থে কোন্ পদকে ব্যবহার করতে চান তা সুনির্দিষ্ট করা[৯]। এমন অনেক পদ আছে যা সাধারণভাবে এক অর্থ প্রকাশ করে এবং যখন তা একাডেমিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন তা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রেও উক্ত পদকে যথার্থ সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এমন অনেক ধারণা ও পদ আছে যাদেরকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার। সেক্ষেত্রে প্রায়োগিক সংজ্ঞা (Operational definition) প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্পষ্ট করতে হবে যাতে গবেষক তাদেরকে কি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা পাঠকের নিকট

অস্পষ্ট না থাকে। প্রায়োগিক সংজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্যই হস্বল ধারনা বা পদকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বোধগম্য করা। এভাবে গবেষণার ব্যবহৃত ধারনা ও পদের যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করলে পাঠকের পক্ষে গবেষণা কর্মটি বুঝতে এবং এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয় না।

(গ) সহজ এবং সঠিক ভাষা

প্রতিবেদন লেখার কাজে ব্যবহৃত ভাষা সহজ-সরল, প্রাণবন্ত ও সঠিক হতে হবে যাতে পাঠকের পক্ষে প্রতিবেদনটি অনুধাবন করা সহজ হয়। পাঠকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সজাগ থেকে প্রতিবেদনে সে অনুযায়ী ভাষা ও শব্দাবলী ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবেদন যদি কেবলমাত্র শিক্ষাবিদ বা সমাজ গবেষকদের জন্য প্রণীত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে টেক্‌নিক্যাল শব্দাবলী (Technical words) নির্দ্বিধায় ব্যবহার করা যেতে পারে। একমাত্র উদ্ধৃতি (Quotation) ছাড়া গবেষণা প্রতিবেদনে জটিল, দুর্বোধ্য কিংবা আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয়। গবেষণা প্রতিবেদনের ভাষায় প্রধানতঃ অতীতকাল (Past tense) এবং তৃতীয় পুরুষের (Third person) ব্যবহার হয়[১০]। সমগ্র প্রতিবেদনে একই প্রকার বানান ও রচনা রীতি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

(ঘ) সুশৃঙ্খল উপস্থাপন

সমগ্র প্রতিবেদনটি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখার মধ্যে একটি পূর্ণ সংগতি বজায় থাকে। পুরো প্রতিবেদনটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপস্থাপন করলে পাঠকের কাছে তা সুখকর পাঠ্য হিসেবে আবেদন রাখতে সক্ষম হয়। সমগ্র প্রতিবেদনটিকে কতকগুলো অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায়কে কতকগুলো অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে হবে[১১]। এভাবে বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংগতি সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ একটি শিরোনাম এবং এর বিভিন্ন উপ-বিভাগের জন্য একাধিক উপ-শিরোনাম ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের এবং

উপ-অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে যেন বর্ণিত বিষয়বস্তুর সংগতি বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঙ) উদ্ধৃতি ও পাদটীকার ব্যবহার

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে উদ্ধৃতি ও পাদটীকার ব্যবহার করতে হবে। কোন স্বীকৃত গবেষকের অভিমত উল্লেখ করে বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুর স্বপক্ষের যুক্তিকে আরো সুদৃঢ় করা অথবা কোন বিষয়ে কোন গবেষক কর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য যদি একই রকম বা ভিন্ন রকম হয় তবে তা উদ্ধৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। কোন বক্তব্যকে ভাষান্তর করলে বা পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করলে ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার বা ভুল বুঝার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তাই সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতির ব্যবহার দরকার হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে অত্যধিক সংখ্যায় কিংবা অতি দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ, এতে পাঠক তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর মনোযোগ বিনষ্ট হতে পারে।

উদ্ধৃতির উৎস পাঠককে অবগত করণের উদ্দেশ্যে পাদটীকা ব্যবহার করা হয়। উদ্ধৃতির পাদটীকা অনুসন্ধিৎসু পাঠককে মূল উৎস খুঁজে বের করে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য লাভে সহায়তা করে। পাদটীকা যে সব সময়ই উদ্ধৃতির উৎস উল্লেখ করার জন্য ব্যবহৃত হয় এমন নয়। কোন লেখক বা গবেষকের কোন গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি থেকে কোন বক্তব্য, ধারণা, যুক্তি বা ফলাফলের সহায়তা গ্রহণ করলে পাদটীকা বা গ্রন্থপঞ্জীতে তা উল্লেখ করতে হয়। পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জীর ব্যবহার থাকলে উক্ত গবেষনা কর্মটি ব্যবহার করে পরবর্তীতে অন্যান্য গবেষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পরিচালিত গবেষণার কাজ সহজ উপায়ে সম্পাদন করতে পারেন।

(চ) প্রতিবেদনের আকার

প্রতিবেদনের গুণগত মান এর আকার বা আয়তনের উপর মোটেই নির্ভর করে না। কারণ একটি প্রতিবেদন আকারে বড় হ'লেই যে তা ভাল হবে এবং আকারে ছোট হ'লেই যে তার গুণগত মান দুর্বল হবে এমন কথার পেছনে কোন যুক্তি

নেই। একটি প্রতিবেদনের আকার তার প্রয়োজনানুযায়ী হওয়া উচিৎ, অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক কোন প্রতিবেদনের আকার বড় বা ছোট করা সমীচীন নয়[১২]। সংগৃহীত তথ্যের উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও ফলাফল সন্নিবেশ করনের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয় ও পদ্ধতির বর্ণনা ও আলোচনার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যতটুকু আকারের প্রতিবেদন তৈরী করা দরকার হয়, প্রতিবেদনের বিস্তৃতি ততটুকুই হবে। এর সামান্য বেশীও নয়,আবার কমও নয়। শুধুই প্রতিবেদনের আকার বৃদ্ধির জন্য অযথা কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা, কিংবা অপ্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করা কোনটাই যুক্তি যুক্ত নয়। সাধারনত একটি প্রতিবেদনের আকার A4 সাইজের কাগজে সর্বনিম্ন ১০০ পৃষ্ঠা এবং সর্বোচ্চ ৩৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া ভাল। তবে এর সামান্য ব্যতিক্রমও হতে পারে।

(ছ) ত্রুটি স্বীকার

একটি সামাজিক গবেষণা বিশাল প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তথ্য সংগ্রহে জটিলতা, বিশেষ করে নমুনায়নের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা, সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরশীলতা সব গবেষণায় সমান থাকে না। বিশেষ করে যে সব সামাজিক গবেষণা মাঠ পর্যায়ে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরিচালিত হয়, তার নির্ভরশীলতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম[১৩]। গবেষণার ফলাফল শুধু গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষক অনুরূপ গবেষণা কর্মে তা ব্যবহার করতে পারেন; আবার উক্ত গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানকল্পে পরিচালিত কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। গবেষণা প্রতিবেদনে এর ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ না থাকলে ব্যবহারকারীগণ উক্ত গবেষণার ফলাফল নির্দ্বিধায় ব্যবহার করে বসতে পারেন, যার ফলাফল পরবর্তীতে অশুভ ও নেতিবাচক হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই একটি উত্তম প্রতিবেদনে গবেষণার ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করা একান্ত দরকার। পূর্ব থেকেই গবেষণার ফলাফলের সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে জানা থাকলে এর সমাধানে যত্নবান হওয়া যায় অথবা এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো

গবেষণা প্রতিবেদন লেখার জন্য একক কোন স্বীকৃত কাঠামো নেই। তবে যে কোন ধরনের গবেষণা প্রতিবেদন লেখার সময় কতিপয় সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে কোন প্রতিবেদন প্রণীত হবলে তা একটি সার্বজনীন আকৃতি সম্বলিত প্রতিবেদনের রূপ লাভ করে; অর্থাৎ প্রতিবেদনটি চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত কাঠামো লাভ করতে সমর্থ হয়।

একটি গবেষণা প্রতিবেদনের তিনটি অংশ থাকে। যথা ঃ

(ক) প্রারম্ভিক অংশ

(খ) মূল অংশ

(গ) নির্দেশিকা

বৃহদাকার গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রতিটি অংশ আবার বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, অতি ক্ষুদ্র প্রতিবেদন শুধু শিরোনাম পৃষ্ঠা ও মূল অংশ-এই দুস্বভাগে বিভক্ত হতে পারে[১৪]। সাধারণভাবে কোন গবেষণা প্রতিবেদন লেখার সময় নিম্নোক্তভাবে গঠন কাঠামো অনুসরণ করা হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কোন নতুন অংশ এতে সংযোজিত হয়, আবার কোন কোন অংশ বাদ পড়ে যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের পার্থক্য হেতুই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

(ক) প্রারম্ভিক অংশ

১. শিরোনাম

২. গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের নাম

৩. সার সংক্ষেপ

৪. ভূমিকা এবং/বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ভূমিকার অংশ হিসেবে ভূমিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; আবার আলাদাভাবেও প্রতিস্থাপনের রীতি প্রচলিত আছে।

৫. সূচিপত্র

৬. সারণী তালিকা

৭. মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছবি ইত্যাদির তালিকা

(খ) মূল অংশ

১. *সূচনা*

১.১. গবেষণার সমস্যা বা বিষয়বস্তু

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

১.৩. গবেষণার উপপ্রমেয় বা অনুমান

২. *গবেষণা পদ্ধতি*

২.১. নমুনা

২.২. উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

২.৩. গবেষণার নকশা ও প্রক্রিয়া

৩. ফলাফল

৪. আলোচনা ও সুপারিশ

(গ) নির্দেশিকা

১. পরিশিষ্ট

২. তথ্য নির্দেশিকা

প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ

(ক) প্রারম্ভিক অংশ

১. শিরোনাম ঃ প্রতিবেদনের শিরোনামের মধ্য দিয়ে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু প্রকাশ পাবে। এর অর্থ এই নয় যে, শিরোনামে গবেষণার প্রতিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিরোনাম এমন হতে হবে যাতে শিরোনাম পড়েই বুঝা যায় সম্পূর্ন প্রতিবেদনে কি বলতে চাওয়া হয়েছে। শিরোনামটি সঠিক, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে। প্রতিবেদন ইংরেজীতে লেখা হ'লে শিরোনামটি সম্পূর্ণ Capital Letter-এ টাইপ করাই ভাল। নীচে গবেষণা প্রতিবেদনের কয়েকটি শিরোনামের উদাহরণ দেয়া হ'লঃ

INTER-COUNTRY COMPARISON OF PUBLIC ENTERPRISE PERFORMANCE : AN APPLICATION TO THE CEMET INDUSTRY OF SOUTH ASIA

FOOD GRAINS DEMAND ELASTICITY OF RURAL HOUSEHOLDS IN BANGLADESH: AN ANALYSIS OF POOLED CROSS-SECTION DATA

STRUCTURAL CHANGE AND POVERTY IN BANGLADESH : THE CASE OF A FALSE TURNING POINT

মৌলিক জাতিগত স্বভাব বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কৌশল

২. গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ শিরোনামের একটু নীচে একই পৃষ্ঠায় গবেষকের (বা গবেষকদের) নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। কোন জার্নালে প্রকাশ করার জন্য লিখিত প্রতিবেদনে গবেষকের নামের সাথে তার ডিগ্রী বা শিক্ষাগত যোগ্যতা পদ বা পদমর্যাদা ইত্যাদি উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু ডিগ্রী লাভের জন্য লিখিত থিসিস-এর ক্ষেত্রে যেই ডিগ্রীর জন্য থিসিস লেখা হয় সেই ডিগ্রীর নাম উল্লেখ করা লাগে এবং থিসিস জমা দেয়ার সাল ও তারিখ উল্লেখ থাকে। ঠিকানা লেখার সময় অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তাকারে লেখা হয় যেমন, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সমাজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, খালিশপুর, খুলনা।

৩. সার সংক্ষেপ ঃ গবেষণা প্রতিবেদনের এই অংশে গবেষণার মূল বিষয় অতি সংক্ষেপে (অনূর্ধ্ব তিন পৃষ্ঠা বা ৮০০ থেকে ১০০০ শব্দে) তুলে ধরা হয়[১৫]। সার সংক্ষেপ পাঠের মাধ্যমে পাঠকবৃন্দ অতি অল্প সময়ে সমগ্র গবেষণা বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারেন। সার সংক্ষেপ পাঠ করার পর কোন পাঠক যদি মনে করেন যে, সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি তাঁর পাঠ করা দরকার অথবা সম্পূর্ন প্রতিবেদনটি পাঠ করার তাঁর প্রয়োজন নেই, তবে সেভাবে তিনি অগ্রসর হতে পারেন। সার সংক্ষেপে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, বিশ্লেষণ, মূল বিষয়ের বিবরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়।

৪. ভূমিকা এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ গবেষক কেন বিষয়টির উপর গবেষণা পরিচালনা করতে আগ্রহী হলেন, এ সম্পর্কে গবেষকের বক্তব্য ভূমিকায় স্থান পায়। এছাড়াও, গবেষণার বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে গবেষকের মন্তব্য এ অংশে ব্যক্ত করা হয়।

বৃহদায়তনের গবেষণা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে গবেষককে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। তাই গবেষক প্রতিবেদনে সেই ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার সাধারণত ভূমিকার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে ভূমিকা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা না দিলে, গবেষক সেক্ষেত্রে 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' শিরোনামে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন।

৫. সূচিপত্র ঃ সূচিপত্র প্রতিবেদনের কোন্ পৃষ্ঠায় কি আছে তা ব্যক্ত করে। তাই কেবলমাত্র থিসিস বা বড় আকারের গবেষণা প্রতিবেদনে সূচিপত্র দিতে হয়। জার্নালে প্রকাশের জন্য লিখিত কোন প্রতিবেদনে বা অতি ছোট আকারের কোন প্রতিবেদনে সূচিপত্র দেয়ার দরকার হয় না। একটি বড় আকারের গবেষনা প্রতিবেদনের সূচিপত্রে অধ্যায়সমূহের নাম এবং অনেক ক্ষেত্রে উপ-অধ্যায়সমূহের নামও উল্লেখ করা হয়। অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়সমূহের অবস্থান প্রতিবেদনের কত পৃষ্ঠায় তাও অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়সমূহের বিপরীতে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদানের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা হয়। সূচিপত্রে সাধারণতঃ ভূমিকা বা সমস্যার বিবরণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার, সংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক গবেষণা, গবেষণার উদ্দেশ্য, আওতা, যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি বা উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল, উপাত্ত বিশ্লেষণ, ফলাফল ও সুপারিশমালা ইত্যাদি বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকে। এছাড়াও, ক্ষেত্র

বিশেষে সারণী তালিকা, চিত্র তালিকা, গ্রন্থপঞ্জী ও পরিশিষ্টের উপস্থাপনাও সূচিপত্রে স্থান লাভ করে। সূচিপত্রে উল্লিখিত শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বরের সাথে প্রতিবেদনের অন্তর্ভূক্ত শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বরের হুবহু মিল থাকা দরকার। অন্যথায় সূচিপত্র অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

৬. সারণী তালিকা ঃ গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ উপস্থাপনের একটি উল্লেখযোগ্য ও সুবিধাজনক পদ্ধতি হস্বল সারণী। একটি তথ্যবহুল বৃহদাকার গবেষণা প্রতিবেদনে একাধিক সারণী থাকতে পারে। বৃহদাকার প্রতিবেদনের মধ্য থেকে অতি সহজেই যাতে সংযোজিত সারণী খুঁজে বের করা সম্ভব হয়, সে-জন্য পূর্বেই সারণীর শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ পূর্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়।

৭. মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছবি ইত্যাদির তালিকা ঃ মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছবি ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সারণী তালিকা প্রস্তুত পদ্ধতির মত একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

(খ) মূল অংশ

১. সূচনা ঃ সাধারণত একটি ভূমিকা প্রদানের মাধ্যমে মূল প্রতিবেদন শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে একে প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ভূমিকা আকারে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের সূচনা নামধারী এই অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূচনায় আলোচিত বিষয় সংক্ষিপ্ত হস্বলে গবেষক অনেক সময় এর অধ্যায় নম্বর নাও দিতে পারেন। তবে একথা সত্য যে, সূচনায় অধ্যায় নম্বর দেয়া হোক আর না হোক, এটি প্রতিবেদনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারনেই সূচনা থেকে প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নম্বর শুরু হয়। সূচনায় সাধারনতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকে[১৬]ঃ

- সংশ্লিষ্ট গবেষণার পটভূমি-কেন বা কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে
- গবেষণা সমস্যার সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট সংগা প্রদান যাতে গবেষণা সমস্যা নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন না থাকে বা কেউ ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করতে না পারে

- গবেষণার উদ্দেশ্য
- প্রতিবেদনের ব্যবহৃত প্রতয় ও অনুমানসমূহ
- গবেষণার যৌক্তিকতা
- গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা
- গবেষণায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ
- তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'নমুনায়ন পদ্ধতি' ব্যবহৃত হ'লে সমগ্রকের বিশদ বর্ণনাসহ নমুনায়নের বিশেষ পদ্ধতির বিবরণ ও উক্ত বিশেষ পদ্ধতি গ্রহনের পেছনে যুক্তি, নমুনার আয়তন নমুনার প্রতিনিধিত্বকারী যোগ্যতা, ত্রুটিসমূহ যাচাই ব্যবস্থা ইত্যাদির সুস্পষ্ট ও বিশদ বিবরণ দেয়ার দরকার হয়
- গুনাত্মক তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত পরিমাপক পদ্ধতি

২. **গবেষণা পদ্ধতি** ঃ প্রতিবেদনের এ অংশে সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য যে উপযুক্ত পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া গ্রহন করা হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে ঃ

- গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহরে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি, নমুনার আকার এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ।
- তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি
- গবেষণা পরিচালনার মেয়াদকাল, বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত সময়ের পরিমান এবং
- গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ, অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহন, তথ্য শ্রেনীবদ্ধকরণ, উপস্থাপন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষককে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
- গবেষণা পরিকল্পনা বা নকশা।

৩. **ফলাফল** ঃ গবেষণা প্রতিবেদনের এ অংশে সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে বিভিন্ন

গাণিতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে সেগুলোর সারসংক্ষেপ ছক বা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপনের মাধ্যমে অধিকতর সহজবোধ্য করে তোলা হয়। তবে ছক বা চিত্রের ব্যবহার মূলত নির্ভর করে সংগৃহীত তথ্যের বৈশিষ্ট্যের উপর। উপাত্তের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করাই ছক বা চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। উপাত্ত উপস্থাপনের প্রচলিত বিভিন্ন কৌশলের পাশাপাশি আরও নতুন নতুন কৌশল দিন দিন সংযোজিত হচ্ছে। এ সব কৌশলসমূহ থেকে উপযুক্ত ও গ্রহনযোগ্য কৌশল বাছাই করে নিতে হয়। গবেষককে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন্ উপস্থাপন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে গবেষণা ফলাফলকে সব থেকে সহজবোধ্য ও আকর্ষনীয়ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। সারণী, রেখাচিত্র বা মানচিত্রের আকার যদি বৃহৎ হয় এবং সেগুলো যদি অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে সেগুলোকে প্রতিবেদনের মূল অংশে সংযোজন না করে পরিশিষ্টে সংযোজন করাই ভাল। তবে তথ্যের আলোচনার স্থানে ঐ তথ্য সম্পর্কিত সারণী, রেখাচিত্র বা মানচিত্র পরিশিষ্টের কত পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হয়েছে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার যাতে পাঠক ইচ্ছে করলেই সংশ্লিষ্ট সারণী, রেখাচিত্র বা মানচিত্রটি দেখতে পারেন। গবেষণা ফলাফলের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যও প্রতিবেদনের এ অংশে উপস্থাপিত হয় যাতে পরবর্তীতে গবেষণার ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠক সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন[১৭]।

৪. আলোচনা ও সুপারিশ ঃ প্রতিবেদনের এ অংশে গবেষণা ফলাফলের ব্যাখ্যা করে সুপারিশমালা প্রনয়ণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অনুরূপ অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের কোন সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় কিনা তা জানার জন্য এদের তুলনা রাখা হয় এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। এছাড়াও, প্রাপ্ত ফলাফলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলো বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। এর অর্থ এই যে, গবেষণা ফলাফল নতুন কোন তত্ত্ব বা জ্ঞানের দিক নির্দেশনা দেয়, অথবা প্রতিষ্ঠিত কোন তত্ত্বকে সমর্থন দান করে-সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়[১৮]। প্রাপ্ত ফলাফল বাস্তব জীবনের কোন সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। গবেষণা ফলাফল পূর্বে নির্ধারিত গবেষণা উপপ্রমেয় সমর্থন করে কিনা, না করলে তার কারণ কি ইত্যাদি সম্পর্কেও এ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত

হস্বলে এ অংশে তা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। গবেষণা বিষয়ের যে-সব ক্ষেত্রে পরবর্তীতে গবেষণা পরিচালনার সুযোগ রয়েছে সে-সব ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কেও এখানে আলোকপাত করা হয়।

(গ) তথ্য নির্দেশিকা

১. পরিশিষ্ট ঃ গবেষণা পরিচালনার জন্য সংগৃহীত যেসব তথ্য-প্রমাণ এবং বিভিন্ন প্রকার উপকরণ প্রতিবদেনের মূল অংশে সরাসরি সংযোজন করা সম্ভব হয় না, সেগুলোকে প্রতিবেদনের পরিশিষ্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। অনেক সময় সারণী, রেখাচিত্র বা মানচিত্রের আয়তন অনেক বড় হ'লে এবং তা বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হ'লে সেগুলাকে প্রতিবেদনের মূল অংশে উপস্থাপন না করে পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে প্রতিবেদনটি সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে অন্য কোন গবেষকের ব্যবহারে লাগার আশায়ও অনেক তথ্য-প্রমাণ ও অশোধিত উপাত্ত গবেষক পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেন[১৯]।

২. গ্রন্থপঞ্জি ঃ গবেষণা প্রতিবেদন লিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এসব বই পুস্তক, জার্নাল বা পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হ'ল উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তি মজবুত করা।

প্রতিবেদনের এ অংশে বই-পুস্তক এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখকদের নাম বর্ণমালা অনুসারে (Alphabetically) লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেক লেখকের নামের পর তাঁর প্রবন্ধ বা বই-পুস্তকের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশনার স্থান, সন ইত্যাদি তথ্যসমূহ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কিত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করার নিয়ম গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং জার্নাল ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরন দেয়া হ'লঃ

George A. Akerlot and Janet L. Yelled (eds). ***Efficiency Wage Models of the Labor Force.*** London : Cambridge University Press, 1986, "Introduction", pp. 1-21.

John R. Harris and Michael P. Todaro. ***"Migration, Unemployment and Development : A Two-Sector Analysis",***

American Economic Review, 60 March 1970), pp. 126-142.

মান্না, এম, এ, *বিপনন যুগে যুগে,* তৃতীয় সংস্করন, ১৯৮৮, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃঃ ৪৫,৫৪।

ইসলাম টি, (১৯৮৮) ঃ *ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ঃ সমস্যা ও সমাধান।* ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, আঞ্চলিক সেমিনার IERB-এর সৌজন্যে, ঢাকা।

প্রতিবেদনের রূপ নিরূপণ সংক্রান্ত সুপারিশমালা

প্রতিবেদনের রূপ সত্যিকার কেমন হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিবেদন তৈরী করলে প্রতিবেদনটি একটি যথার্থ প্রতিবেদনের রূপ পাবে বলে আশা করা যায় ঃ

- প্রতিবেদন বাস্তবসম্মত হওয়া দরকার। গবেষণার উদ্দেশ্যানুযায়ী সংগৃহীত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাস্তবসম্মতভাবে ইহা প্রণয়ন করতে হবে। কেউ যদি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় বা তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি আন্তরিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার যথার্থতা যাচাই করতে পারেন।

- প্রতিবেদনটিকে একটি পরিপূর্ণ রূপ পেতে হবে। অর্থাৎ ইহা যেন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের রূপ নেয়। এর অর্থ হস্বল গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যানুযায়ী সব প্রয়োজনীয় বিষয়ই যেন এতে অন্তর্ভূক্ত থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন কিছুই যেন আলোচনা থেকে বাদ না যায়।

- প্রতিবেদন যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। ইহা বিশাল আকারে হ'লে পাঠকের মনোযোগ বিনষ্ট হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে এর আয়তন ছোট করতে হবে।

- গবেষককে বুদ্ধিগত দিক থেকে সৎ (Intellectually honest) থাকতে হবে। তাঁর জানা মতে তিনি কখনোই মিথ্যা বা ভুলের প্রশ্রয় দিবেন না।

- প্রতিবেদনটি সুখপাঠ্য হওয়া বাঞ্চনীয়। ইহা এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা পাঠক মনে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পাঠক মনে আগ্রহ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে প্রতিবেদনে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তা পাঠকের কাছে চির অজানাই রয়ে যাবে।

- প্রতিবেদনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকা উচিৎ। এর কোথাও যেন কোন প্রকার ছন্দপতন না ঘটে। প্রত্যেক অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়ের মধ্যে সংগতি রেখে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্টতার অভাবে পাঠকের মনোযোগ বিনষ্ট না হয়।

সুপারিশমালা

প্রবন্ধের আলোচনায় একথা মূর্ত হয়ে উঠেছে যে,গবেষণা প্রতিবেদন লিখন একটি জটিল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পাঠকের নিকট গবেষণাকর্ম বা গবেষণার ফলাফল পৌছায় প্রতিবেদন আকারে। তাই প্রতিবেদন লেখার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি যাতে যথার্থ এবং পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে তার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা পেশ করা হলো ঃ

ক. গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর সংগৃহীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে

খ. প্রতিবেদন লেখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন বিশেষ শ্রেনীর পাঠকের উদ্দেশ্যে তাম্বপ্রণীত হলে সেটি তাদের উপযোগী হচ্ছে কিনা

গ. প্রতিবেদন নতুন জ্ঞান ও তত্ত্ব প্রকাশের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে

ঘ. প্রতিবেদনে গবেষণা সমস্যার সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে যাতে গবেষণার সমস্যা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে বা কেউ ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দিতে না পারে

ঙ. প্রতিবেদন যাতে পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

চ. প্রতিবেদনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি যুক্তিপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে

ছ. পাঠকবৃন্দ যেন গবেষকের কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই উপস্থাপিত তথ্যসমূহ এবং গবেষণার ফলাফলের তাৎপর্য ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে

জ. গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে অনুরূপ গবেষণার ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে এবং

ঝ. গবেষণালব্ধ ফলাফলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে।

পাদটিকা ও তথ্য নির্দেশিকা

Berenso, Canard, and Colton, Raymond (1971), ***Research and Report Writing for Business and Economics,*** Random Press, New York.

Ghosh, B. N. (1982), ***Scientific Methods and Social Research,*** Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

রউফ, কাজী আবদুর ও ইলাহী, মউদুদ (১৯৯৩), ***সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা,*** পদ্ধতি, সুজনেষু প্রকাশনী, ঢাকা।

Kothari, C. R. (1994), ***Research Methodology,*** New Age international Limited, India.

বেগম, নাজমির নূর (১৯৯২), ***সমাজ গবেষণা পরিচিতি,*** বুক হাউস, ঢাকা।

Tandon, B. C. (1979), ***Research Methodology in Social Science,*** Chaitanya Publishing House, Allahabad.

Acoff, R. L. (1953), ***The Design of Social Research,*** University of Chicago Press, Chicago and London.

মালেক, আবদুল, সরকার, নীহাররঞ্জন ও রহমান, আজিজুর (১৯৯০), ***সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি,*** হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

Negel, Stuart S. and Neef, Marion (1979), ***Policy Analysis in Social Science Research,*** Sage Publications, London.

Emory, C. William (1976), ***Business Research Methods,*** Retard D. Irwin, Inc. Homeward, IIlinois.

Ferber, R. and Verdooom, P. J. (1962), ***Research Methods in Economics and Business,*** The Macmillan Company, New York.

Williamson, J. and carp, D. (1977), ***The Research Craft : An Introduction to Social Science Methods,*** Little-Brown, Boston.

Freedman, P. (1960), ***The Principles of Scientific Research,*** 2nd ed., Persimmon Press, New York.

Gopal, M. H. (1964), ***An Introduction to Research Procedure in Social Science,*** Asia Publishing House, Bombay.

Tandon, B.C. (1979), ***Research methodology in Social Science,*** Croitanya Publishing House, Allahbad

Rose, Reanold Marshall (1954), ***Theory and Methods of the Social Science,*** University of Minnesota Press, Minneapolis.

রহমান, হাবিবুর (১৯৯০), ***সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি,*** হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

Mossier, C. A. and Clayton, G. (972), ***Survey Methods in Social Investigation,*** Basic Books, New York

তপন, শাহজাহান (১৯৮৭), *অ্যাসাইনমেন্ট ও থিসিস লিখন ঃ পদ্ধতি ও কৌশল,* হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী

উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব ঃ একটি জরিপ ভিত্তিক বিশ্লেষণ

খন্দকার ওমর মুয়ীদ *

A Study of Attitudes of Madrasa Studeent in Bangladehs Towards Women Empowerment

- Khandkar Omar Mueed

Abstract : Education is considered a universal agent of the process of socialization to accept modern values and attitudes towards women Empowerment. In this regard as a medium of education, madrasa may take an important role in the acceptance of modern values and belief systems. After our liberation, we could not establish a united education system. We had to continue two-education system simultaneously. In 1980, Madrasas, which are religious educational institutions were recognized by an Ordinance. Hence it became a strong and powerful actor of our politics. Now we cannot ignore the importance of madrasa education in our national politics. We know the phenomenon of 'Development' is related to the combined participation in productive and reproductive activities of male and female. In this regard, we have to give importance to religious sentiment because most of our people are Muslims. If we are not able to evaluate their attitudes, all laws and ordinance regarding women's empowerment will not be fruitful to the society. I found in my research that most of the students of madrasa are not supporting socio-political and economic activities for women (e.g. service, political participation and leadership etc.). So, we have to find out the attitudes of madrasa student towards women's empowerment and then we can take policies which will be helpful towards women empowerment.

---

* এমফিল গবেষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়ন প্রত্যাশী দেশের জন্য নারী ও পুরুষের সমান অংশদারিত্বমূলক অংশগ্রহন জরুরী বিষয়। এ জন্য প্রয়োজন নারীর উৎপাদনমুখী অংশগ্রহণের পথে সকল বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতার অপসারণ। শুধু আইন প্রণয়ন নয়, নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মনোভাবও ইতিবাচক হতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গঠনে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা, শিক্ষা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সময়োপযোগী মূল্যবোধ গড়ে উঠে।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কোর্ট ইতোমধ্যে ফতোয়ার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। হাইকোর্টের ফতোয়া বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো সংগত কারনেই জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলে-যে আন্দোলন এখনো অব্যাহত রয়েছে। কাজেই একথা বলা অযৌক্তিক হবে না, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিকে অবহেলা করে নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি ইতিবাচক আইন প্রনয়ন করা হলেও তার সফল বাস্তবায়ন করা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি সাধারণ শিক্ষার ভূমিকার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকাও জানা দরকার। আর মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকার মূল্যায়নের জন্য অন্যতম মাপকাঠি হলো নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের অনুসন্ধান করা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব অস্বীকার করার নয়। আর এক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ রয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক ইয়াহিয়া আখতার তাঁর এক গবেষণায় দেখান যে, সাধারণ স্কুলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা সচেতনতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী (Akhter, 1991 : 203)। কাজেই নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের অনুসন্ধান যথেষ্ট গুরুত্ব দাবী করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

এ গবেষণার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব জানার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীর শিক্ষা, চাকুরী, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নারী নেতৃত্ব ও সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব জানার মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণা কর্মটি জরিপ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণায় একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দুটি মাদ্রাসা, -গাইবান্ধা সদরের 'খান্‌কা শরীফ সিদ্দিকিয়া সিনিয়র দ্বিমুখী মাদ্রাসা' ও গোবিন্দগঞ্জ থানার 'মহিমাগঞ্জ বহুমুখী আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা'র মোট ৩০০জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে মতামত গ্রহন করা হয়েছে।

কার্যকরী চলকের সংজ্ঞা ঃ

মনোভাব

মনোভাব ব্যক্তির একটি অপেক্ষাকৃত ধীর স্থির মানসিক প্রবণতা। সাধারণভাবে কোন চলতি ঘটনা বা প্রপঞ্চ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, মূল্যায়ন করাটাই হলো মনোভাব। Encyclopaedia of Brittinica-এ মনোভাব (Attitude) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"In social psychology, a predisposition to classify objects and events and to react to them with some degree of evaluative consistency. While attitudes logically are hypothetical constructs (i.e., they are inferred but not objectively observable), they are manifested in conscious experience, verbal reports, gross behavior, and physiological symptoms. (Multimedia CD : Encyclopedia of Brittanica Delux 2000)"

জি. ডব্লিউ. আর্লপোর্ট (১৯৩৭) এ প্রসঙ্গে বলেন, "মনোভাব মানসিক ও

স্নায়বিক প্রস্তুতি স্বরূপ যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠিত হয় এবং ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তুর সাথে তার প্রতিক্রিয়ার উপর নির্দেশক ও গতিশীল প্রভাব বিস্তার করে।" (Allport, 1930)

ডি. জে. বেম বলেন, "ব্যক্তি বিশেষ, বস্তু, ধারণাসমূহ বা ঘটনাবলী সম্পর্কে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক মূল্যায়নকে মনোভাব হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।" (Bem : 1970)

মনোভাবের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়, যেমনঃ

১. কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে অবহিতমূলক বিশ্বাস (Cognitive belief);

২. কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে মূল্যায়নের অনুভূতি (Affective) এবং

৩. আচরণ সম্পর্কিত (Behaviour)।

অনেক মনোবিজ্ঞানী অবশ্য উল্লেখিত তিনটি উপাদানকেই মনোভাব বলে মতামত দিয়েছেন। মনোভাব একটি শিক্ষালব্ধ আচরণ। ইহা বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। উপাদানসমূহঃ

১. চাহিদা পূরণ ও মনোভাব

২. সামাজিক প্রভাব

৩. তথ্য পরিবেশন ও মনোভাব

৪. পুরস্কার-শাস্তি ও মনোভাব

৫. একাত্মীভাবন ও মনোভাব

৬. সভা-সমিতি ও মনোভাব

৭. ব্যক্তিত্ব ও মনোভাব।

শিক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোভাব গঠনের কাজ দ্রুত করা সম্ভব।

নারীর ক্ষমতায়ণ

লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে মানব সমাজের সদস্য হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সম অধিকার পাওয়া ও ভোগ করার বিষয়কে নারীর ক্ষমতায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ক্ষমতায়ণ পদ্ধতি নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং পরিবার যে নারীর অধস্তনতার উৎস এটা বলে থাকে। সেই সাথে এটাও মনে করে যে, নারীর প্রতি নির্যাতনের যে অভিজ্ঞতা তা তাদের বর্ণ, শ্রেনী ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিমন্ডলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন; যা এটাই নির্দেশ করে যে, নারীকে একই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান নির্যাতনমূলক কাঠামো ও অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। (গুহঠাকুরতা, ১৯৯৭ ঃ ১৮০)। 'উন্নয়ন পদক্ষেপ' এ ক্ষমতায়ণ (Empowerment) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"The Empowerment approach comes from women's groups who seek to empower themselves through greater self-reliance. They do not seek integration into mainstream aid or development, in which they have no choice in defining the society they want. Women seek to influence their own change, and the right to determine their own choice in life. They also seek to gain control of and access to resources. This approach differ from the Equity approach in origin and strategies. It emerges from women who have been involved in liberation struggles and grass roots women's organizations, and is articulated in the writing of feminists in the south. The Empowerment approach recognizes the triple role of women, and seeks to meet both Strategic and practical Needs. (Union Padokkhep, 1995 : 77)

অপর দৃষ্টিকোন থেকে ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ঃ

১. বস্তুগত সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে, স্থানিক সম্পদ, যেমনঃ জমি, জলাশয়, বনভূমি ইত্যাদি, মানবিক সম্পদ যেমন- মানব দেহ এবং আর্থিক সম্পদ, যেমন- অর্থ

২. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যেমনঃ জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি ও

৩. আদর্শিক সম্পদ যেমনঃ একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়;-এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা (রহমান, ১৯৯৭ ঃ ৯০-৯১)

উন্নয়ন সাহিত্যে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়, "Good Governance, legitimacy and creativity and creativity for a flourishing private sector, transformation of economies to self-reliant, human center development, promotion of community development through self help with an emphasis on the process rather than on the completion of particular projects; a process of collective decision-making and collective action; and popular participation, a concept that has gained popularity within the development agenda" এ উপাদানগুলো ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দিকগুলোকেই নির্দেশ করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে "empowerment affirm the need to build the capacity of communities to respond to a changing environment by inducing appropriate change internally as well as externally and through innovation" (Sigh, 1995 : 13)। সার্বিকভাবে বলা যায়, নারীর ক্ষমতায়ণ হচ্ছে পুনরুৎপাদন ও উৎপাদনশীল ভূমিকা, সম্প্রদায় ব্যবস্থাপণা ভূমিকা ও সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক ভূমিকার সমষ্টি।

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও বাস্তবতা

বাংলাদেশের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারে নারী ও পুরুষের ক্ষমতায়নে সম-অধিকারের বিষয়টি বলা হলেও কার্যতঃ বাংলাদেশের নারীর অবস্থান অধঃস্তন। বাংলাদেশের নারীর অবস্থান ও শর্তকে নিম্নের চিত্রে সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় ঃ

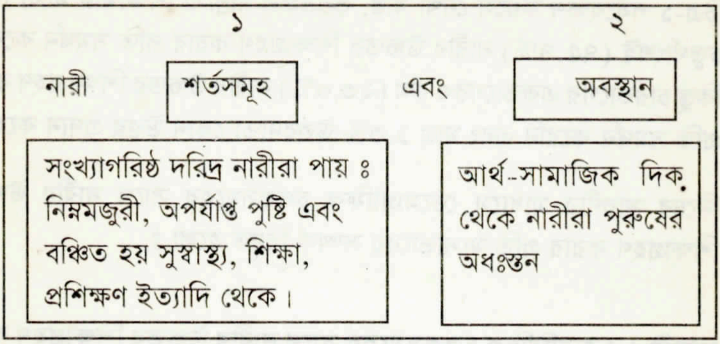

(Unaayon Paddokkkhep, 1995 : 28)

উপাত্ত বিশ্লেষণ

নারী-শিক্ষার প্রতি মনোভাব

উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ নারীর ক্ষমতায়ণের একটি অন্যতম ধাপ। উপযুক্ত শিক্ষা নারী ও পুরুষকে উৎপাদনশীল হতে সহায়তা করে থাকে। নারীর উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলোঃ

চিত্র-১ : নারীর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহন করার প্রতি ৩০০ জন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মনোভাবের বন্টন (%)

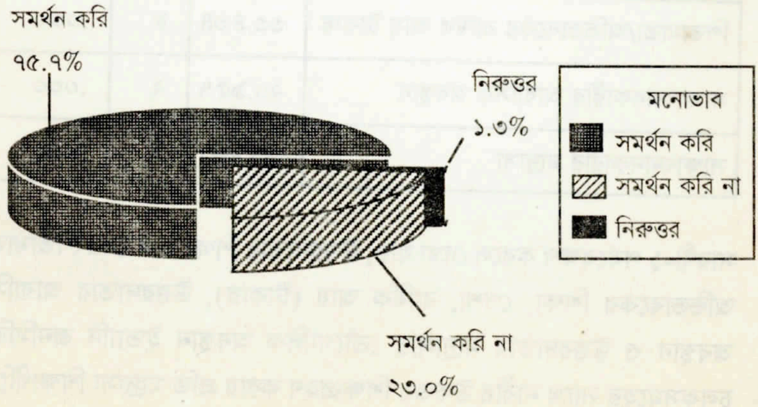

চিত্র-১ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ৩০০জন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই (৭৫.৭%) নারীর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি সমর্থন করেছে, কিন্তু চারভাগের একভাগেরও কম (২৩.০%) নারীর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি সমর্থন করেনি এবং মাত্র ১.৩% উত্তরদাতা কোন উত্তর প্রদান করেনি।

নিম্নের সারণীর মাধ্যমে ডেমোগ্রাফিক চলকসমুহের সাথে নারীর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি মনোভাবের সম্পর্ক বিধৃত হলো ঃ

সারণী-১ ঃ জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নারীর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি উত্তরদাতাদের মনোভাবের সম্পর্ক

জনমিতিক চলকসমূহ	মান **(Value)**	**df**	কাইবর্গ **(Chi-test)**
লিঙ্গ	২.৮০৮	২	২৪৬
বয়স	৩২.১৬৪	৪	.০০০
সাক্ষাৎদানকারীর শিক্ষা	৩৭.৩০৭	৪	.০০০
পিতামাতা/অভিভাবকের শিক্ষা	৩২.৯৫৭	১০	.০০০
পিতামাতা/অভিভাবকের পেশা	৯৯.০৭৭	৮	.০০০
পিতামাতা/অভিভাবকের বার্ষিক আয় টাকায়	৩৩.৪৩৪	৮	.০০০
সাক্ষাৎদানকারীর আবাসিক অবস্থান	২০.৯৫৭	২	.০০০
সাক্ষাৎদানকারীর মাদ্রাসা	৬৩.৪৬১	২	.০০০

সারণী-১ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, উত্তরদাতার শিক্ষা ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের শিক্ষা, পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ও উত্তরদাতার মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নারীর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের

মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০০) খুবই গভীর কিন্তু লিঙ্গের ভিত্তিতে এ সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.২৪৬) মোটামুটি।

নারীর চাকুরি করার প্রতি মনোভাব

সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের চাকুরি পাওয়ার অধিকার আছে। ইহা একজন নাগরিকের ক্ষমতায়ণের সাথে জড়িত একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য চাকুরি করার প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব নিম্নের চিত্রে উপস্থপিত হলো ঃ

চিত্র-২ ঃ নারীর চাকুরি করার প্রতি উত্তরদাতাদের মনোভাবের বন্টন (%)

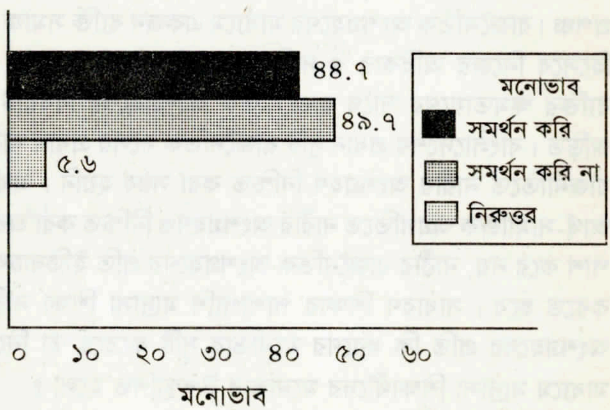

সমর্থন করি	৪৪.৭ (১৩৪)
সমর্থন করি না	৪৯.৭(১৪৯)
নিরুত্তর	৫.৬(১৭)

চিত্র-২ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় দুই ভাগের একভাগ (৪৯.৮%) নারীর চাকুরি করার প্রতি সমর্থন করেনি, কিন্তু পাঁচ ভাগের দুইভাগের বেশী (৪৪.৭%) উত্তরদাতা নারীর এ বিষয়টির প্রতি সমর্থন করেছে এবং অতি সামান্য অংশ (৫.৬) উত্তরদানে বিরত থেকেছে। নারীর

চাকুরি করার প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জনমিতিকে চলকসমূহের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

উত্তরদাতার শিক্ষা ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের শিক্ষা, পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ও উত্তরদাতার মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে চাকুরীজীবি নারীর প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০০০) খুবই গভীর, কিন্তু লিঙ্গের ভিত্তিতে এ সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০২৪) ততটা গভীর নয়।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি মনোভাব

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের জন্য রাজনৈতিক অংশগ্রহন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নিজের অধিকার ও দাবী-দাওয়া উপস্থাপন করতে পারে। একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়ণের সাথে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নারী হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অথচ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে নারীর অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা জরুরী। শুধু আইন পাশ করে নয়, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি কি ধরণের মনোভাব সৃষ্টি করেছে তা নিম্নের চিত্র-৩ এর মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব উপস্থাপিত হলো ঃ

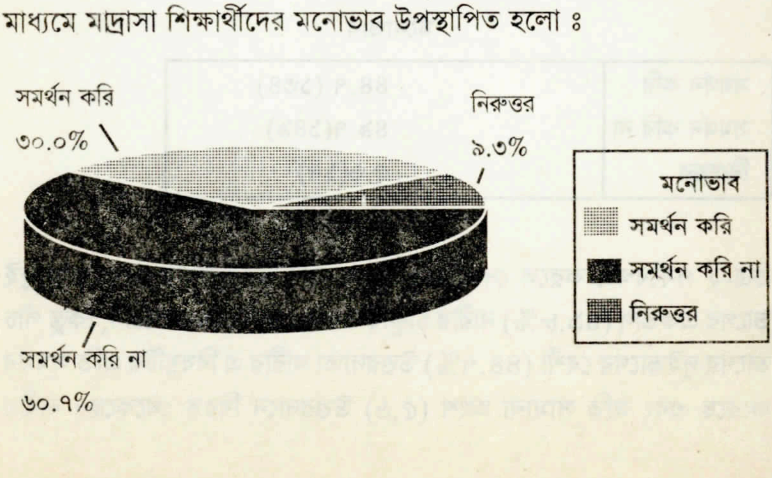

চিত্র-৩ ঃ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬০.৭% নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহনের প্রতি সমর্থন করেনি। মাত্র ৩০.০% উক্ত বিষয় সমর্থন করেছে এবং অবশিষ্ট ৯.৩% উত্তরদানে নীরবতা পালন করেছে। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহনের প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জনমিতিক চলকসমূহের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

উত্তরদাতার, লিঙ্গ, শিক্ষা ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের শিক্ষা, পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ও উত্তরদাতার মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহনের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০০০) খুবই গভীর।

নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি মনোভাব

যোগ্যতার বলে একজন নারী নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, নারীর ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলো ঃ

চিত্র ৪ : নারী নের্তৃত্বের প্রতি উত্তরদাতাদের মনোভাব (%)

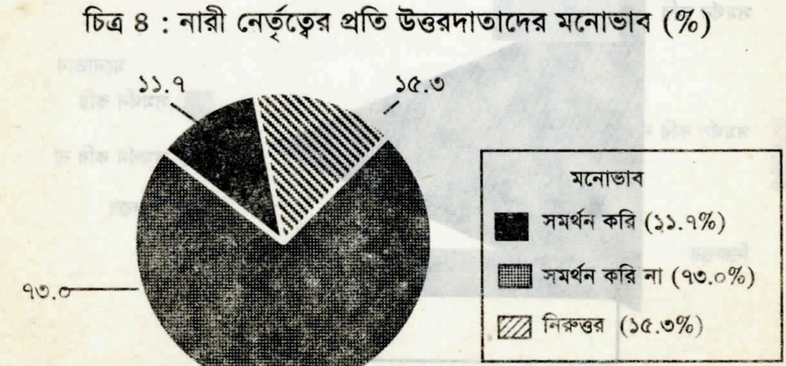

সমর্থন করি	সমর্থন করি না	নিরুত্তর
১১.৭	৭৩.০	১৫.৩

মনোভাব

চিত্র - ৪ বিশ্লেষনে দেখা যায়, ৩০০ জন উত্তরদাতার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৩.০%) নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করে না ও ১১.৭% নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করে ও ১৫.৩% ভাগ উত্তরদানে নীরব থেকেছে। নারী-নেতৃত্বের প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জনমিতিক চলকসমূহের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

উত্তরদাতার শিক্ষা ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), উত্তাদাতার আবাসিক অবস্থান ও উত্তরদাতার মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নারী-নেতৃত্বের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০০০) খুবই গভীর, কিন্তু উত্তরদাতাদের লিঙ্গের ও তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের শিক্ষার ভিত্তিতে ভাল সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০৩৫ ও .০১০) বিদ্যমান।

সনদপত্রে পিতামাতার নাম-লিখণের প্রতি মনোভাব

সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখন বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নারীর ক্ষমাতয়ণের জন্য একটি বিশেষ উপাদান। নিম্নের চিত্র-৫এর মাধ্যমে এ ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব উপস্থাপিত হলো ঃ

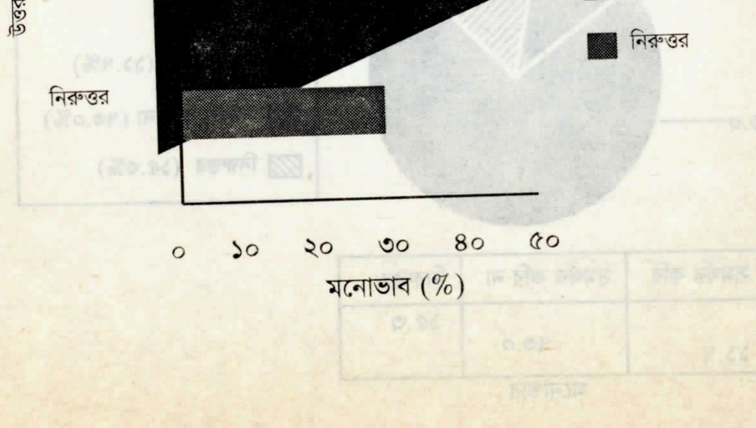

চিত্র - ৫ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ (৪৮.০%) সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না ও বাকী অংশের মধ্যে মাত্র ২১.৩% ভাগ এ বিষয়টিকে সমর্থন করলেও উত্তরদাতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৩০.৭%) উত্তরদানে নীরবতা পালন করেছে। সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জনমিতিক চলসমূহের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ও মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নপদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল.০০) খুবই গভীর আর উত্তরদাতাদের শিক্ষা (কাইবর্গের ফলাফল-.২০) ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকেদের শিক্ষা (কাইবর্গে ফলাফল-.০০১) এর ক্ষেত্রে ততটা গর্ভর নয়। কিন্তু লিঙ্গের ভিত্তিতে এ সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-..৮৪৬) নাই বললেই চলে।

উপসংহার

সার্বিক আলোচনায় দেখা যায়, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা নারীর শিক্ষা গ্রহণকে মোটামুটিভাবে সমর্থন করলেও নারীর চাকুরী করা, নারীর রাজনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব[১] এবং সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সমান সামাজিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতির প্রতি তাদের মনোভাব ইতিবাচক নয়। আলোচ্য প্রবন্ধ প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে দেখা যায়, নারীর পুনরুৎপাদন ভূমিকার প্রতি তাদের সমর্থন আছে। উল্লেখ্য, উন্নয়নে একজন ব্যক্তির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন উভয় ভূমিকার প্রয়োজন হয়। নারীর ক্ষমতায়ণেও এ দুটি বিষয়ের গুরুত্ব আছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব

---

১. হাদিসে বলা হয়েছে, যে জাতি একটি মেয়েকে শাসন ক্ষমতায় বসায়, সে জাতি কখনও উন্নতির মুখ দেখবে না। কিন্তু এই হাদিসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। আবু বকরা এর কাছ থেকে আল-হাসান, তাঁর থেকে আইয়ুক, তাঁর থেকে উছমান ইবনুল হিসাম এ হাদিসটি শুনেছেন। (The Struggle of Muslim Women , (বাংলা অনুবাদ, OSFDER, ঢাকা ঃ ২৪ ইস্কাটন গার্ডেন, ১৯৯২ : পৃ. ৫১-৫৪)।

নারীর পুনরুৎপাদন ভূমিকার প্রতি বেশী। উল্লেখ্য, ইসলামী শরীয়তের সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ণের আধুনিক ধারণার সাযুজ্যতা নেই বিধায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি আগ্রহী নন বরং অনেক ক্ষেত্রে এ ধারণা ইসলামী দর্শনের পরিপন্থী বলে উত্তরদাতারা যুক্তি দেখিয়েছেন।

সার্বিক আলোচনায় একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ধর্ম ও ধর্মীয় আবেগ এদেশের সামাজিক পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রভাবক। সরকারকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায়ে আধুনিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচী সমন্বয় করে, উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার দূরত্ব দূর করে সময়োপযোগী রূপদান দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, নতুবা নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য গৃহীত কোন আইন তৃণমূল পর্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না।

তথ্য নির্দেশিকা

গুহ ঠাকুরতা, মেঘনা ও সুরাইয়া (১৯৯৭) *রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন ঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ।*

মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য (সম্পা.) *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*।ঢাকা ঃ সামজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

রহমান, শাহীন (১৯৯৭) *জেন্ডার পরিভাষা কোষ*।উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ঢাকা।

Akhter, Mohammed Yeahia (1991), ***"Political Behavior of the Madrasa Students in Bangladesh"*** in M. Salimullah Khan, (ed.). ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি, ঢাকা, ১৯৯১।

Allport, G. W. (1937) ***Personality, a psychological interpretation*** N. Y. : Hot Rinehart and Wins ton Inc.

Bem, D. J., (1995) ***Beliefs, Attitudes and Human Affairs,*** Calf : Brooks/ Cole.

Caroline O. N. (1991) ***Gender Planning in the Third World Meeting Practical*** and ***Strategic Needs in Rebecca Grant and Kathleen New Lands*** (eds.) ***Gender and International Relations.*** Open University Press.

Encyclopedia of Britannica (Delux) -2000

Sing, Naresh and Tiji Vangglie (1995) ***Empowerment : Towards Sustainable Development.*** Zed Books Ltd. : London

Unnayon Paddokkhep. ***More About Gender. Steps Towards Development.***, 2nd Issue, April-June'95, PP-77.

Unnayon Paddokkhep. ***Empowerment of Women : in the Context of Rural Bangladesh, Steps Towards Development.*** 2nd Issue, April-June'95, PP-28. Dhaka.

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী

উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

সংবাদপত্রে ২০০০ সালের পরীক্ষা ভাবনা ঃ একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ হান্নান *

The Public Examinations of 2000 as Reflected in Newspapers : A Review

- Mohammed Hannan Ph.D

Abstract : The evaluation process of academic attainment in education system of Bangladesh is faulty. There is rampant scope of copying in it. There is also social resistance against it. Every year the newspapers heading the propensity of copying. But the point of socio administrative resistance is conspicuously absent in the newspapers. This article has consulted 20 top national dailies and one weekly for research in the face of the public examinations of the year 2000. The newspapers tend to exaggerate the propensity of copying in a lot of examination centers. But it is also true that tendency of copying is every low in many center. The newspapers do not highlight news on that. If they ever do that insignificantly and allocate a very small space in the inner pages. A study of newspaper reports on the public examinations shows different sorts of information about involvement of the guardians and teachers in cheating in the examinations, weakness of the administration resisting, copying and also the stand of the court in this respect. Thus print media create a creative impression about the examination system in our country. Inspite of this, this sort of treatment by the newspaper has a positive impact which paves way for consolidating people's support socially against cheating in the examinations.

---

* সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন দিক এই পর্যালোচনা প্রতিবেদনে জাতীয় সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এতে কোন আঞ্চলিক সংবাদপত্র ব্যবহৃত হয়নি, মোট ২০টি জাতীয় সংবাদপত্র এবং একটি মাত্র জাতীয় সাপ্তাহিকের রিপোর্ট এই প্রতিবেদন তৈরীতে ব্যবহার করা হয়েছে।

জাতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ছিল ঃ

১. বাংলাদেশ অবজারভার	২. ডেইলি ষ্টার
৩. নিউ নেশন	৪. দি ইন্ডিপেন্ডেট
৫. দৈনিক ইত্তেফাক	৬. দৈনিক জনকণ্ঠ
৭. সংবাদ	৮. ভোরের কাগজ
৯. আজকের কাগজ	১০. দৈনিক ইনকিলাব
১১. প্রথম আলো	১২. দৈনিক দিনকাল
১৩. দৈনিক মানব জমিন	১৪. দৈনিক খবর
১৫. মুক্তকণ্ঠ	১৬. বাংলাবাজর পত্রিকা
১৭. দৈনিক মাতৃভূমি	১৮. বাংলার বাণী
১৯. দৈনিক সংগ্রাম	২০. যুগান্তর এবং
২১. সাপ্তাহিক ২০০০।	

২০০০ সালের এইচএসসি এবং আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা চলাকালীণ সংবাদপত্রগুলি থেকে পরীক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ এবং প্রকাশিত আলোকচিত্র এই প্রতিবেদনে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষা নিয়ে এসময় সংবাদপত্রে প্রচুর নিবন্ধ, চিঠিপত্র এবং অনেক সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়, এগুলিও পর্যালোচনাকালে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সংবাদপত্রে পরীক্ষা ভাবনা শিরোনামে রিপোর্টটি তৈরী করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পরীক্ষা সংক্রান্ত খবর পরিবেশনে সংবাদপত্রের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোর নিজস্ব পরীক্ষা প্রতিবেদনের সঙ্গে ঘটনার সত্যাসত্য নিরীক্ষণে সহায়তা করা।

২০০০ সালের এইচএসসি এবং আলিম, ফাজিল, কামিল পরীক্ষার্থী ও অন্যান্য তথ্যাবলী

শিক্ষা বোর্ডগুলো থেকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০০ সালের এইচএসসি ও আলিম, ফাজিল এবং কামিল পরীক্ষায় সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬,১২,৩৭৬ জন। সারাদেশে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার জন্যে মূল কেন্দ্র ছিল ১৭৭০টি। এতে ঢাকা বোর্ডের ২৫০টি, রাজশাহী বোর্ডের ২৫৯টি, কুমিল্লা বোর্ডের ১৫৪টি, যশোর বোর্ডের ১৯৭টি, চট্টগ্রাম বোর্ডের ৯৩টি এবং মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম ২৬৫টি, ফাজিল ২৬৪টি, কামিল ১১১টিসহ মোট ৬৪০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মূল কেন্দ্রের পাশাপাশি বেশ কিছু উপকেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছিল।

২০০০ সালের এইচএসসি ও মাদ্রাসা পরীক্ষার সকল বোর্ডসহ মোট ৩২,০৪৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৫,৯৯০ জন, রাজশাহী বোর্ডে ১২,৬৭৩ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৪,৭২২ জন, যশোর বোর্ডে ৪,৫৭০ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ১,৭৬৮ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ২,২১২ জন বহিষ্কৃত হয়।

২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার তুলনায় ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃত ছাত্রের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। সংখ্যার দিক থেকে এসএসসিতে বহিষ্কৃত হয়েছিল ২৯,৮৭৭ জন, অন্যদিকে এইচএসসিতে বহিষ্কৃত হয় ৩২,০৪৩ জন। অথচ এসএসসিতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় ১১ লাখ, কিন্তু এইচএসসিতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল এর প্রায় অর্ধেক, মাত্র ৬ লাখের অল্প কিছু বেশী। সে হিসেবে এসএসসির তুলনায় এইচএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃতের সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগেরও বেশী। এতে বোঝা যায়, সারাদেশে ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার সময় মার্চ মাসে যে গণসচেতনতা ও প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল তা সবিশেষ কার্যকর ফল দেয় মে মাসের এইচএসসি পরীক্ষার সময়।

এ বছরে এইচএসসি ও মাদ্রাসার পরীক্ষা চলাকালীন ২৬ জন কলেজ শিক্ষক বহিষ্কৃত হয় এবং আরো অধিক সংখ্যক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। এর মধ্যে রাজশাহী বোর্ডে ১৬ জন, যশোর বোর্ডে ৪ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

বোর্ডে ৬ জন শিক্ষক বহিস্কৃত হন। ঢাকা, চট্রগ্রাম, কুমিল্লা এবং কারিগরী শিক্ষা বোর্ডে এ বছর কোন শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়নি। ২০০০ সলের এসএসসি পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক ৯০ জন স্কুল শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছিল। শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার চরম সমালোচনার মুখে দুই মাসের মাথায় যখন এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়,তখন কলেজ শিক্ষকদের বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে কলেজ শিক্ষকবৃন্দ শুধু দায়িত্ব সচেতন হননি, পরীক্ষার হলে তারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখান এবং নকল প্রবণতা রোধেও তার প্রভাব পড়ে।

শুরুতেই মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের পরীক্ষার্থীদের নিয়ে বিতর্ক

মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিষয়ে ২৬ এপ্রিল, ২০০০ তারিখে হাইকোর্ট যে রায় দেয় পরদিন ২৭ এপ্রিল পরীক্ষার দিনে সংবাদপত্রে তা শিরোনাম হয়ে আসে। ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক মাস পূর্ব থেকেই এই কলেজের ছাত্রীদের বিষয় নির্বচন জটিলতায় পরীক্ষা দেওয়ার সংকট নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

২৭ এপ্রিল বিভিন্ন সংবাদপত্র মতিঝিল মডেল কলেজের এই পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করে। এক যুগান্তর পত্রিকাই তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় ২৭ এপিল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে এর উপর তিনটি আলাদা আলাদা প্রতিবেদন করে। এতে একটিতে 'ওরা আজ পরীক্ষা দিতে পারবে' শিরোনামে বলা হয়, ১৩২ জন ছাত্রী সবাই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন্ব। এই সংবাদের একই স্তরকে আবার তারাই লিখেছে, 'হাইকোর্ট ১২৮জনকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছে'। 'সকলেই খুশী' শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠাতেই পত্রিকাটি আবার লিখে, ১৩২ জন ছাত্রী শেষ পর্যন্ত তাদের আন্দোলনে জয়ী হয়েছে। চার কলামের অপর একটি শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় একই পত্রিকায় আবার লিখে, '১২৮ জন ছাত্রীও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে'।

২৮ এপ্রিলও এই পত্রিকাটির ভ্রান্তি ঘোচেনি। যুগান্তর ২৭ এপ্রিলের এইচএসসি পরীক্ষার খবর পরিবেশন করতে গিয়ে ২৮ এপ্রিল লিখেছে, 'মতিঝিল মডেল কলেজের ১৩২ জন ছাত্রী সবাই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে'।

প্রকৃতপক্ষে, এদের ১১১ জন পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল, পরে আরো ১জন পরীক্ষা না দেওয়ায় ১১০ জন পরীক্ষা দেয়। পত্রিকাটি ন্যূনতম খবর অনুসন্ধান না করেই ডেস্কে বসেই এসব তথ্য পরিবেশন করেছে। সংবাদপত্রের তথ্য মাঝে মাঝে কতটা 'নির্ভরযোগ্য' উৎস থেকে পরিবেশন করা হয়ে থাকে এখান থেকে তা কিছুটা আঁচ করা যায়।

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার লগ্নে মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ১৩২ জন ছাত্রীর বিষয়ে পত্র-পত্রিকাগুলো যে এত সোরাগোল করেছির তা হচ্ছে, অনিয়ম করে হলেও তাদরে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কলামিষ্ট ড.মুনতাসির মামুন দৈনিক জনকণ্ঠে এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন,তাঁর প্রবন্ধ ধরে পরদিন ৬ জন বুদ্ধিজীবি একটি বিবৃতি দেন। তাঁদেরও একই বাক্য ছিল, নিয়ম বিরুদ্ধ হলেও ১৩২ জন পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বুদ্ধিজীবিরা এটাও বলেন, এই অনিয়মটা শুধু এবারের জন্যেই, আর দেওয়া হবেনা, এটা যেন সরকার বলে দেয়। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবিরাও জানতেন, এটা অনিয়ম, আবার এই সুযোগ আর যেন না দেওয়া হয় সে জন্যে সতর্কও করছিলেন।

এভাবে তাঁরাও অনিয়মটারই বাস্তবায়ন চেয়েছেন। কেউ বিষয়টা দায়িত্ব সচেতন হয়ে দেখেননি এর পরিণাম কিহতে পারে। সারাদেশের ৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী যে ভুল করেনি, একটি কলেজের ১৩২জন সকলেই সে ভুল একসঙ্গে করলো কেন, এই প্রশ্ন কেউ ভেবে দেখেননি। একবার তাদের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিলে পরের বছরই যদি সারাদেশে একরম ৩ হাজার পরীক্ষার্থী এসে যায়, তখন কর্তৃপক্ষ তাদের অনুমতি না দিয়ে কোথায় যাবেন! বছর বছর এ অনিয়মকে যে তারপর কর্তৃপক্ষকেই বহন করতেহবে, এবং তখন সংবাদপত্রই আবার এনিয়েই সংবাদ পরিবেশন করবেযে,বোর্ডে দুর্নীতির কারণেই এই অনিয়ম বেড়ে গেছে। বিশেষ করে, মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের বিষয় নির্বাচনের ত্রুটি মেনে নিলে একমাস লেখাপড়া করে ৪০০ মার্কের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভভ ধারণায়ও স্বীকৃতি দেওয়া হত। তাহলে তা দু'বছরের কোর্স করার প্রয়োজন নিয়ে কথা উঠতো। বিশেষ করে লেখপড়ার বিষয় নির্বাচনে ফ্রি স্টাইল

প্রবণতা আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিত। এ নিয়ে ২৬ এপ্রিলে দেওয়া হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, 'মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রীদের ফলাফল প্রদান স্থগিত থাকবে'।

২৮ এপ্রিল দৈনিক 'যুগান্তর' মতিঝিল মডেল কলেজের ছাত্রীদের বিষয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি মন্তব্য কলাম ছাপে। এতে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার চরিত্র মঞ্জুলিকার বাবার প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে বলা হয়, 'কোন মতেই ইঞ্চিখানেক এদিক ওদিক একটু হবার জো নেই'। সব মিলিয়ে মন্তব্য কলামটির মূল বক্তব্য ছিল শিক্ষামন্ত্রী কেন এত নিয়ম-নিয়ম করেন। একটু অনিয়ম হলে দোষ কি! সরাসরি নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের প্রকাশ্য জেহাদ এমনটা আর কখনো দেখা যায়নি।

সংবাপত্রের কল্যাণে নকলবাজরা হয়ে যায় 'বিক্ষুব্ধ ছাত্র'

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৭ এপ্রিল। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই এই পরীক্ষা এবং পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে এভাবে নানা খরব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে মহানগরীর ছাত্ররা শিক্ষা বোর্ডে যে হামলা, ভাংচুর চালায় সংবাদপত্রগুলো তাকে 'বিক্ষোভ' বলে অভিহিত করে। পরীক্ষাকে সামনে রেখে এক কলেজের ছাত্রদের নিজ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিবর্তে ভিন্ন কলেজে পরীক্ষা দানের ব্যবস্থাপনা চট্টগ্রামের নকলবাজ ছাত্ররা মেনে নিতে রাজী হয়নি। নকলবাজ ছাত্রদের সমর্থন করে সংবাদপত্র লিখে ঃ

ঘেরাওকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বোর্ডে বেশ কিছু ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ এপ্রিল ২০০০] বস্তুত সংবাদপত্রের কল্যাণে নকলবাজ উচ্ছৃংখল ছাত্ররা এভাবে 'বিক্ষুব্ধ' ছাত্রের মর্যাদা লাভ করে।

ভেন্যুর নামে পরীক্ষা কেন্দ্র

পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রকে সামনে করে প্রতি বছরই সৃষ্টি হয় নানা অনাকাঙিক্ষত

ঘটনা। শিক্ষাবোর্ডের কর্তৃপক্ষ নানা চাপ ও অসহিষ্ণুতার মাঝে ভেন্যুর নামে পরীক্ষা কেন্দ্রই চালু করে থাকেন। এসএসসি পরীক্ষায় ভেন্যুর অনুমতি দিয়ে থাকেন জেলা প্রশাসকগণ, কিন্তু এইএসসি পরীক্ষায় ভেন্যুর অনুমতি দিয়ে থাকেন শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজেই। 'ভেন্যুর নামে পরীক্ষা কেন্দ্র' শিরোনামে একটি রিপোর্ট ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার প্রাক্কালে প্রকাশ করেছিল দৈনিক ইত্তেফাকঃ

নতুন কেন্দ্র খোলার উপর বিধি-নিষেধ থাকায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আগামীকাল ২৭ এপ্রিল হতে অনুষ্ঠিতব্য এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ভেন্যুর নামে কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, এগুলি খোলা হয়েছে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহেলর চাপে পড়ে। ১৯৯৯ সালে পরীক্ষা কেন্দ্র ও ভেন্যুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬৪ ও ১৩। ১৯৯৯ সালে ঠাকুরগাও জেলার রানীসংকইল, নীলফামারী জেলার জনতা কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল কলেজ ও কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র ব্যাপক নকলের অভিযোগে বাতিল করার পর এবং আরও দুইটি কেন্দ্র হ্রাস করে কেন্দ্র খোলা হয় ২৫৯টি। কিন্তু ভেন্যু করা হয়েছে ২৪টি। ১৯৯৯ সালে যে চারটি কলেজ কেন্দ্র বাতিল করা হয় সেগুলির মধ্যে জনতা কলেজকে বাদ দিয়ি অন্য তিনটি কলেজে ভেন্যু করা হয়েছে। যে সব কেন্দ্রের সহিত এই সব ভেন্যু দেখানো হয়েছে তার মধ্যে দূরত্ব দেখানো হয়েছে সর্বোচ্চ দশ কিলোমিটার। অভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, প্রভাবশালীদের চাপে শিক্ষা বোর্ড নকল নিয়ন্ত্রণ করতে চাহিয়াও পারছে না।...

১৯৯৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রটি ব্যাপক অনিয়মের জন্য বাতিল করা হলেও শেষ মুহূর্তে পরীক্ষার ভেন্যু স্থাপনের নামে কার্যত পুনর্বহাল করা হইয়াছে। জোরালো তদবিরের ফলেই ইহা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়াছে। অথচ ২৫ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরে ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়া উল্লেখ করা হয়েছে, বাতিলকৃত কেন্দ্রসমূহ কোনক্রমেই চালু করা হবে না। [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০০]

নকল রোধে পুরস্কার ঘোষণা

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের জন্য মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানা পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি নকল ধরতে পারলে নকল প্রতি পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। ২৪ এপ্রিল শ্রীপুর ডিগ্রী কলেজের অফিস কক্ষে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এই ধরনের উদ্যোগে ভাল ফল পাওয়া যায়। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ এপ্রিল ২০০]।

নকল প্রবণতা দেখাতে তৎপর সংবাদপত্র ডেস্ক

২০০০ সালের পরীক্ষা বিষয়ক যে সব সংবাদ এইচএসসি পরীক্ষার প্রাক্কালে প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় সারাদেশে নকল বিরোধী একটা বড় রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত দেখানোতে সংবাদপত্রগুলো ছিল খুবই তৎপর। পত্রিকাগুলোর রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়, তারা বিশেষ বিশেষ টিম পাঠিয়েছিলেন নকলের খবর সংগ্রহ করে আনতে। বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোর কুমিল্লা অভিযান এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। একটি পত্রিকা কুমিল্লার একটি সরকারী কলেজে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র ভাংচুরের ছবি ছাপে। ক্যাপশনে বলা হয়, নকলে বাধা দেওয়ায় এরা ভাংচুর করে' [যুগান্তর ২৮ এপ্রিল ১৯৯৯]। এর অর্থ এই যে, এই কেন্দ্রে নকল করতে দেওয়া হয়নি, নকল করতে দিলে তো ভাংচুর হতো না। নকল করার সুযোগ না দেওয়াতেই নকলবাজরা ভাংচুর করেছে। পত্রিকাটি পরীক্ষায় প্রথম দিনের সংবাদ পরিবেশন করে তারপর ঢালাওভাবে লিখেছে, নকলের অবাধ সুযেগা না পেয়ে পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শনে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।...দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া দেশব্যাপী পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে গণহারে নকল হয়েছে। [যুগান্তর, ২৮ এপ্রিল, ২০০০]। একই পত্রিকা নকলের ছবি প্রকাশ করতে গিয়ে শেষ পৃষ্ঠায় কয়েকটি আলোকচিত্র প্রকাশ করে, এর মধ্যে দুটিতে হাফপ্যান্ট পরা দুটি শিশু দৌড়াচ্ছে, তৃতীয়টিতে অভিভাবকরা অপেক্ষা করছেন,চতুর্থ ছবিতে একজন পুলিশ এক নকলবাজকে গ্রেফতার করেছে। উপরিউক্ত সংবাদ এবং আলোকচিত্রগুলি প্রমাণ করছে না অবাধ নকল হচ্ছে।

কিন্তু সংবাদপত্রগুলোর শিরোনাম ও ইনট্রো-তে তা-ই দাবী করেছে। অথচ ভেতরের কথাতে বোঝা যায়, শিরোনামের মতো নকলের বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে এমন খবর পরিবেশনটা অতিরঞ্জিতই। পরীক্ষার্থী নকলের সুযোগ না পেয়ে ভাংচুর করছে কিন্তু সংবাদপত্র বলছে 'বিক্ষোভ' করছে। নকলের দাবীতে উচ্ছৃংখলতা কখনো 'বিক্ষোভ' অভিদায় মূল্যায়নকৃত হতে পারে না, কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদপত্র তা-ই করছে। অবাধ নকলের প্রমাণ নয়, বরং নকল করতে দেওয়া হচ্ছে না,এটা তারই প্রমাণ। ৩০ এপ্রিল 'যুগান্তর' খবর প্রকাশ করে বলে, রাজবাড়ি সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজে নকল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় 'বিক্ষুদ্ধ' ছাত্র-জনতা পরীক্ষা কেন্দ্রে হামলা চালায়। নকল করতে সুযোগ দিলে তো নকলের দাবীতে আর সংবাদপত্রের ভাষায় 'বিক্ষোভ' আয়োজন হতো না। পুলিশ নকলবাজকে ধরছে, এটা নকলের খবর নয়, বরং নকল বিরোধী এ্যকশনের খবরেরই অংশ।

নকলমুক্ত পরীক্ষা এবং সংবাদপত্রের পরিবেশন প্রবণতা

এইচএসসি, কারিগরি এবং মাদ্রাসার পরীক্ষার ১৭২টি কেন্দ্র সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট এই প্রতিবেদন তৈরীকালে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০০০ সালের এই পাবলিক পরীক্ষায় শুরু থেকে সংবাদপত্রগুলোর একটি প্রবণতা (Trend) ছিল পরীক্ষায় নকলের 'ভয়াবহতা' দেখানো। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এই কাজে পূর্ব থেকেই সংবাদপত্রগুলো তাদের মফস্বল সংবাদদাতাদের 'নকলের খবর ও চিত্র' পাঠানোর নির্দেশ দেয়। 'নকলের স্বর্গ' মনে করে ঢাকার প্রায় সবগুলো প্রধান কাগজ ২৭এপ্রিল ২০০০তারিখে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠায় কুমিল্লার বিভিন্ন কেন্দ্রে। মনে হয় সংবাদপত্রগুলো কুমিল্লা অভিযান আংশিক সফল হয়েছিল, ফলে কুমিল্লার রেদওয়ান আহমেদ কলেজ এবং অজিত গুহ কলেজে নকলের ব্যাপকচিত্র কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। [ডেইলি ষ্টার, প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০]।

কিন্তু কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম কলেজে সংবাদপত্রের নকল খোঁজার মিশন সফল হয়নি। এক সময়ে চৌদ্দগ্রাম কলেজ 'নকলের স্বর্গ' বলে পরিচিত ছিল, কিন্তু এ বছর ২০০০ সালে এখানে নকলের ব্যাপক সুযোগ না পেয়ে নকলবাজ

পরীক্ষার্থীরা কলেজের আসবাবপত্র ভাংচুর করে। নকলে সুযোগ দেয়নি বলে আঃ রহিম নামে একজন প্রভাষককে এসব উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থীরা লাঞ্ছিতও করে। আবার কলেজে কর্তব্যরত মূল ভিজিল্যান্স টিম পরীক্ষার্থীদের নকলে সহায়তা দান করায় ইয়াসমিন আরা নামে একজন শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে এতোদিনকার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। (প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০০)।

অথচ সংবাদপত্রে এই ভাংচুরের খবরই বড় করে এসেছে। যেখানে নকলের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে প্রভাষকও লাঞ্ছিত হয়েছে, সংবাদপত্রে বড় 'ব্যানার হ্যাডের' কারণে মনে হয়েছে এটা নকলের বড় ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে এখানে নকল করতে দেওয়া হয়নি বলে এসব উচ্ছৃংখল আচরণ ঘটেছে, এমনকি দায়িত্বে অবহেলার জন্যে একজন শিক্ষিকাকে শাস্তি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে- সংবাদপত্রের এ ঘটনার´treatment হচ্ছে এমনটি যে, এখানে 'ভয়াবহ' নকলের ঘটনা ঘটছে।

কুমিল্লার নাঙ্গলকোট কলেজ কেন্দ্রে নকল বিরোধী এ্যাকশন এতটা কঠোর হয়েছিল যে, প্রথম দিনই পরীক্ষা দিতে আসা একটি কলেজের ৯৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯১ জনই বহিষ্কৃত হয়েছিল। বহিষ্কৃত হয়ে এরা কলেজের বিজ্ঞানাগারে ভাংচুর চালায়। সংবাদপত্রগুলি নকল বিরোধী এই এ্যাকশনের খবর প্রশংসা করার পরিবর্তে 'বহিষ্কারের মাত্রা অনুযায়ী নকলের মাত্রা' বোঝাতে সংবাদটি প্রকাশ করে। (দেখুন, যুগান্তর, প্রথম আলো ২৮ এপ্রিল ২০০০)।

খুলনা থেকে কয়েকটি পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো সরেজমিনে ঘুরে এসে জানিয়েছিল, এই জেলার যে সব নকল প্রবণ কেন্দ্র ছিল সেগুলোতে এ বছর এত সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, এমন সুষ্ঠু পরীক্ষা স্থানীয়রা এর আগে কখনো দেখেননি। নকল প্রত্যাশী পরীক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে চলে গেছে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০০)।

কিন্তু দৈনিক জনকণ্ঠ এই সংবাদটি প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে চাপলেও প্রথম আলো ছেপেছে ভেতরে অন্যান্য খবরের ভেতের খুবই অগুরুত্বপূর্ণ করে। খুলনা

দেশের তৃতীয় বৃহত্তম মহানগরী হলেও এই জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর এই ভাল খবর অন্য সকল সংবাদপত্রে একেবারে উধাও হয়ে গেছে। দৈনিক ইত্তেফাক ৪মে এক উপসম্পদকীয় লিখে খুলনার নকলহীন পরীক্ষা নেওয়ার প্রশংসা করে।

অথচ কোন একটি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে দেওয়াল টপকে নকল সরবরাহ করার রঙিন আলোকচিত্র সংবাদপত্রে বিশাল শিরোনামকৃত হয়ে এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, নকলে দেশ ছেয়ে গেছে। প্রথম আলো অবশ্য কুমিল্লা অঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর নকলের আলোকচিত্র ফলাও করে প্রকাশ করলেও একই দিন (২৮ এপ্রিল) তাদের প্রতিবেদনের মূল কাহিনীতে উল্লেখ করে যে, 'দেশের অধিকাংশ স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে এবং রাজধানীসহ প্রধান শহরগুলোতে সুষ্ঠভাবে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে'। আবার অন্যত্র উল্লেখ করে, 'উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ কেন্দ্রে খোলাখুলি নকল ও সহিংসতা ঘটেছে'।

ইংরেজি পরীক্ষার পর অবশ্য সারাদেশেই পরীক্ষা-চিত্র সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। মুক্তকণ্ঠ (পয়লা মে) জানায়, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করায় ব্যাপক হারে নকলের প্রবণতা কমে যাওয়ার খবর মিলেছে। মুক্তকণ্ঠ ৩ মে তারিখে সারাদেশেই নকল প্রবণতা কমে এসেছে বলে রিপের্ট করে। ভোরের কাগজ এবং আজকের কাগজও একই দিন (পয়লা মে) জানায়, এইচএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে পরীক্ষায় কড়াকড়ি হয়েছে, নকল কমে এসেছে। দৈনিক জনকণ্ঠ আলাদা শিরোনাম করেই খবর প্রকাশ করে যে, 'এইচএসসি পরীক্ষায় নকল কমেছে'। দৈনিক সংবাদও প্রায় একই সুরে (পয়লা মে) উল্লেখ করে, 'দেশের কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক কড়াকড়ির কারণে নকল হয়েছে কমস্ব। একই দিন বাংলাবাজার পত্রিকা জানায়, 'বাংলা পরীক্ষা থেকে নকল প্রবণতা কমতে শুরু করেছে'।

কিন্তু দৈনিক 'যুগান্তর' সারাদেশে নকল কমে যাওয়ার এই খবর মানতে চায়নি। তারা পয়লা মে লেখে, 'গণনকল, বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে এইচএসসি বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা হয়েছে'। 'যুগান্তর' অবশ্য পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই জ্যোতিষীর মতো ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছিল যে, এ বছর নকল হবে এবং ছাত্ররা পরীক্ষায়

নকল না করার কোন পরামর্শ মানবে না। (যুগান্তর, ২৭ এপ্রিল ২০০০)। ফলে তার ৭মে পরীক্ষার মূল্যায়ন করে লেখে, 'এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে সাড়াশি অভিযান পরিচালনার ঘোষণা চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। নকল আগের চেয়ে কমেনি, বরং বেড়েছে'। যুগান্তরের মতো দৈনিক ইনকিলাব ২৮ এপ্রিল লেখে যে, 'সর্বকালের ভয়াবহ নকল' এবং ৩মে লেখে, 'নকলের মহামারী কর্তৃপক্ষ সামান্যতমও রোধ করতে পারেনি'।

'নকলের মহোৎসব' শব্দ ব্যবহারে সংবাদপত্রের বিরোধিতা

নকলের প্রকোপ বোঝানোর জন্যে গত কয়েক বছর ধরে সংবাদপত্রগুলো 'মহোৎসব, 'মহোচ্ছব' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ শুরু করে। ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার সময় সকল সংবাদপত্রই এই শব্দযোগে খরব প্রকাশ করতে থাকে। অনেক সংবাদপত্রকে দেখা যায়, মহোৎসব শব্দ ব্যবহার করেই যেন আনন্দ পাচ্ছে। ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার সংবাদ পরিবেশনে দৈনিক মানব জমিনও এর ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষাকালে দৈনিক মানবজমিন এক সম্পাদকীয় লিখে নকলের সংবাদ প্রকাশে সংবাদপত্রের 'মহোৎসব' শব্দ ব্যবহায়ের বিরোধিতা করে। পত্রিকাটি সম্পাদকীয়তে বলে ঃ

১. 'দেশের সবক'টি কেন্দ্রের চিত্র হতাশাব্যঞ্জক নয়'।

২. 'হাজার হাজার কেন্দ্রের মধ্যে দু'একশ কেন্দ্রে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি ও এক-আধটু নকল হওয়ার ঘটনা ঘটতেই পারে'।

৩. 'একদিনে নকলমুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়'।

সংবাদপত্রগুলোকে উদ্দেশ্য করে 'মানব জমিন' আরো বলেঃ

৪. 'নকলে নিরুৎসাহিত করার জন্যে আমাকে বাহুল্যতা বর্জন করতে হবে। নকলের 'মহোৎসব' সর্বাংশে সঠিক নয়।...সে অবস্থা বিরাজমান নয় এবং এ বছর নকলের ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

দৈনিক মানবজমিনের এই সম্পাদকীয় ছিল পরীক্ষা সম্পর্কে তার সংবাদ

পরিবেশনের এতদিনকার ভূমিকার ঠিক বিপরীত। সম্পাদকীয়টি পরীক্ষা সম্পর্কিত লেখালেখির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা আনে।

পরীক্ষার নকল রোধে নানারকম ব্যবস্থা

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতি দমনে নানারকম প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল কৌতুক কর ঃ

১. নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ভোলা সরকারী কলেজের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ৪ ফুট গভীর এবং ১০ ফুট চওড়া করে দীর্ঘ খাল খনন করা হয়। কর্তৃপক্ষ ভেবেছেন, এই খাল পার হয়ে নকল সরবরাহকারীরা কলেজের কাছে অসাতে পারবে না। ভোলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এইচএসসি পরীক্ষা প্রস্তুতি সভায় নকল প্রতিরোধে খাল খননের এই অভিনব উদ্যোগের কথা জানানো হয়। (দৈনিক ইত্তিফাক, ২৫ এপ্রিল ২০০০)।

২. রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের নকলমুক্ত মন নিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপণ দেয়। (তবে দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগান্তর' ২৭ এপ্রিল ২০০০ সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপণের সমালোচন করে সম্পাদকীয় লেখে)।

৩. দেশের অধিকাংশ জেলা শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে আন্তঃকলেজ আসন বিনিময় ব্যবস্থার অধীনে এক কলেজের ছাত্রকে অন্য কলেজে পরীক্ষা দেওয়ানোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনায় এ পদ্ধতি খুবই কাজ দেয়। {দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ এপ্রিল ও ১৬ মে ২০০০ এবং প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০০}।

৪. নকলবাজদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হয়। [মুক্তকণ্ঠ, ৩০এপ্রিল ২০০০]।

৫. রাজশাহীতে অবসরপ্রাপ্ত এবং অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটিরত শিক্ষকদের দিয়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭মে ২০০০]।

৬. লালমোহন সরকারি শাহবাজুর কলেজের দেওয়ালে আলকাতরা লেপনকরে দেওয়া হয় যাতে বহিরাগতরা জামা-কাপড়ের আলকাতরা লেগে যাওয়ার ভয়ে দেওয়াল না টপকায়। [দৈনিক ইত্তিফাক, পয়লা মে ২০০০]।

৭. বেঞ্চে লিখে নকল করার সুযোগ প্রতিরোধ করতে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর কেন্দ্রে লোহার ব্রাশ এবং শিরিশ পেপার ব্যবহৃত হয়। [মুক্তকণ্ঠ, পয়লা মে ২০০০]।

৮. নকল সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করতে কুষ্টিয়ায় ভিডিও ক্যামেরা প্রস্তুত রাখা হয়। ফলে মামলার ভয়ে বহিরাগতরা কেন্দ্রের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৮মে ২০০০]।

শিক্ষকদের ভূমিকার সমালোচনা

অন্যান্য বছরের পরীক্ষার মতো ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায়ও শিক্ষকদের ভূমিকা সমালোচিত হয়েছে। তবে ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার তুলনায় এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক। ফলে এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষক বহিস্কার কিংবা পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে শিক্ষকের অব্যাহতির ঘটনা ছিল কম।

১. আবার কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে দেখা গেছে সমান-সমান ঘটনা, এক শিক্ষক পরীক্ষায় নকল করতে দেননি বলে নকলবাজ কর্তৃক লাঞ্চিত হয়েছেন, আবার এই একই কেন্দ্রে একজন শিক্ষয়িত্রী নকলে সহায়তা করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত পেয়েছেন। এ বিষয়ে দেখুন, চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ কেন্দ্র সম্পর্কে প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০০০ তারিখের রিপোর্ট]।

২. ঠাকুরগাঁও সালন্দর ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে কলেজ শিক্ষকদের পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেন ও হাইস্কুলের শিক্ষকরাও পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করে।

এরা প্রকাশ্যে ছাত্রদের নকলে সহায়তা করে। [আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]

৩. বরিশালের হিজলা কেন্দ্রে জেলা প্রশাসক নকল রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শিক্ষকদের অসহযোগিতার জন্যে এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। [আজকের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]

৪. রাজশাহীর পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহের অপরাধে দু'জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হন [ভোরের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]।

৫. কুড়িগ্রাম ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকদের সহায়তায় অবাধ নকল চলে। [ভোরের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]

৬. ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার কলেজের কমনরুমে বসে বহিরাগত ও শিক্ষকরা এক্ষেত্রে উত্তরপত্র লিখে দিয়েছে। [মুক্তকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৭. সাতক্ষীরায় কতিপয় শিক্ষকের অসহযোগিতার কারণে নকলরোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। [যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৮. একদল দুর্বল অনভিজ্ঞ শিক্ষক আমাদের গলারকাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৯. সান্তাহার সরকারি কলেজ ও রহিমউদ্দিন কলেজ কেন্দ্রে শিক্ষকদের সহায়তায় ফ্রিষ্টাইলে নকল হয়েছে। [মুক্তকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল]

১০. বগুড়ার নশরপুর কলেজের ম্যাজিষ্ট্রেট দুস্বঘন্টা পরে কেন্দ্রে পৌঁছার কারণে শিক্ষকদের সহযোগিতায় বেপরোয়া নকল চলে। [মুক্তকণ্ঠ, পয়লা মে ২০০০]

১১. শিক্ষকদের পেশাগত কোন দায়বদ্ধতা নেই। জবাবদিহিতাও নেই। তাঁর ফাঁকি ধরার প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা নেই। [সংবাদ, ৩মে ২০০০]

১২. সিরাজগঞ্জ মাওলানা ভাসানী কলেজ কেন্দ্রে হিসাব বিজ্ঞানের শিক্ষক লুৎফর রহমান নকল সরবরাহের সময় হাতে নাতে গ্রেফতার হন। [দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো,৩মে ২০০০]

১৩. যশোরে নকল সরবরাহের সময় দু'জন মাদ্রাসার শিক্ষক ধরা পড়েন এবং বহিস্কৃত হন। [প্রথম আলো, সংবাদ, ৫মে ২০০০]

১৪. গাজীপুরের বেলাসী সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্রে বোরখার নীচে করে মাদ্রাসার ছাত্রীরা প্রকাশ্যে নকল করলেও মাদ্রাসার শিক্ষকরা বাধা দেননি, বরং সহায়তা করেছেন। [ভোরের কাগজ, ৫ মে ২০০০]

১৫. নকল সরবরাহকারী ও সহায়তাকারী শিক্ষকদের শাস্তি না হওয়ায় পরীক্ষায় অসদুপায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব শিক্ষকদের অনেকের নামের সঙ্গে 'প্রফেসর' শব্দ ব্যবহার করা হয়। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৫মে ২০০০]

১৬. মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের কিছু সংখ্যক শিক্ষক কিভাবে নকল করতে হবে তার ওপর ছাত্রদের বিশেষ কোচিং করিয়েছেন। এই কলেজের ইংরেজির একজন প্রভাষক নকলের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন পরীক্ষার্থীদের। [সাপ্তাহিক ২০০০, ৫মে ২০০০]

১৭. নকল রোধের প্রধান কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাশ নেয়া নিশ্চিত করতে হবে। [যুগান্তর, ৭মে ২০০০]

তবে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষকদের এমন ভূমিকা এসএসসি পরীক্ষার তুলনামূলকভাবে কম। বোঝা যায়, স্কুল শিক্ষকদের তুলনায় কলেজ শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ বেড়েছে। দেখা যায়, মাদারীপুরে প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে একযোগে সহযোগিতা করে নকল দমন করেছে শিক্ষকরা। [মুক্তকণ্ঠ, ১১মে ২০০০]

শিক্ষকদের জন্যে পুরস্কার

শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবার চেয়ে বেশী হুমকির সম্মুখীন হন। ফলে সরকার থেকে তাদের জন্যে পুরস্কারও রয়েছে। রাজশাহী সিটি কলেজে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন কলেজের জনৈক প্রভাষক এবং একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান তাঁদের বাসায় গিয়ে দেখা করে সমবেদনা জানান এবং পুরস্কার প্রদান করেন। [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫মে ২০০০]

দৈনিক জনকণ্ঠে ৩ মে ২০০০ তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমতির একে এম ইসলাম ও কাজী ফারুক আহমেদ সৎ, নীতিবান এবং সাহসী শিক্ষকদের জন্যে শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পুরস্কার ও সণ্মানী প্রদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে সংবাদপত্র

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশাসনের ভূমিকার মিশ্ররূপ প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। প্রধানত পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরের পরিবেশ সুন্দর রাখার দায়িত্ব পুলিশ এবং কর্তব্যরত ম্যাজিষ্ট্রেটের। ছাত্রদের কাছ থেকে নকল বের করা ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব নয়, কিন্তু শিক্ষকরা যেহেতু নকল ধরেন না, সেহেতু ম্যাজিষ্ট্রেটরা এটা করতে বাধ্য হচ্ছেন, ফলে শিকক্ষকরা এর প্রতিবাদও করতে পারছেন না, তার নিজের দুর্বলতার কারণেই। শিক্ষকরা যদি তাদের নিজের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতেন, তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক নকল ধরার বিরুদ্ধে তাঁরা অবস্থান নিতে পারতেন। কিন্তু নিজেরা যেহেতু কাজটি করছেন না, ফলে অন্যের হস্তক্ষেপ তার মেনে নিতে হচ্ছে।

৩মে ২০০০ তারিখে সংবাদ-এ প্রকাশিত এক উপসম্পাদকীতে পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন না করায় শিক্ষকদের প্রবল সমালোচনা করা হয়, কিন্তু একই নিবন্ধে বলা হয় 'নকল বন্ধে' প্রশাসনের আচরণ কর্তৃত্ববাদিতার এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, তারা ধরেই নিয়েছেন 'সমস্ত শিক্ষকই নকলের সহায়তাকারী'। বস্তুত এই

অভিযোগ সত্য হলেও শিক্ষকরা সামাজিকভাবে এর প্রতিবাদ করার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। ফলে প্রশাসনের কর্তৃত্ব তাকে হজম করতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে প্রশাসনের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার জন্যে 'সন্মানী' 'মাসোহারা' উপঢৌকন যে একটি 'কালচারে' পরিণত হয়েছে সেটি একটি 'ওপেন সিক্রেট' বটে। সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে প্রচুর খবর প্রকাশিত হয়। এ খবর ম্লান করে দেয় সে সব ঘটনায় যেখানে নকল করতে সুযোগ না দেওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১. ভোরের কাগজ ২৮ এপ্রিল ২০০০ তারিখে খবর প্রকাশ করে জানায়, নাসিরাবাদ বালক স্কুল কেন্দ্রে সকাল ১১টা পর্যন্ত কোন ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করতে যায়নি।

২. রাউজান কলেজ ও গহিরা কলেজ কেন্দ্রে একদিকে অবাধ নকল হয়েছে, অন্যদিকে ম্যাজিস্ট্রেট ডাবের পানি খেয়েছে। [ভোরের কাগজ, ২৮ এপ্রিল ২০০০]

৩. প্রশাসনের দুর্বলতার কারণেই বোর্ডের পরীক্ষায় নকল হচ্ছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৪. জামিরাত কলেজ কেন্দ্রে শিক্ষকদের ডিউটির পাওনা টাকার ২৬ হাজার নজরানা দিতে হয়েছে প্রশাসনে ডিউটিরত আনাসর, ম্যাজিস্ট্রেটকে।

৫. পরীক্ষা শুরুর ২ ঘন্টা পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট না পৌছায় অবাধ নকল চলে। [মুক্তকণ্ঠ, পয়লা মে ২০০০]

৬. ম্যাজিস্ট্রেটের ভুলের কারণে বাণিজ্য নীতি পরীক্ষায় প্রথমপত্রের বদলে দ্বিতীয়পত্র বিলি হয় [ভোরের কাগজ, ৪মে ২০০০]।

৭. মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা বরাবরের মতো লক্ষ্যণীয়। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মে ২০০০]

কুমিল্লায় এত নকলের সংবাদ

প্রশাসনের সুকঠিন কড়াকড়ি ভূমিকার কারণে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় নকল কমে আসার বিভিন্ন চিত্রের ব্যতিক্রম ঘটনা উপরিউক্ত সংবাদগুলো। এমন ব্যতিক্রমের আরো একটি উদাহরণ পাওয়া যায় ১৯ মে ২০০০ তারিখে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের মধ্য দিয়ে। 'যুগান্তর' ২০০০ সালে নকলের সংবাদ নিয়ে এতোটা 'মাতামাতি' করেছিল যে, মনে হয়েছে তারা নকলের বিরুদ্ধে জেহাদকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৯মে 'কুমিল্লায় এত নকল কেন?' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি নকলবাজদের ক্রীড়ণক হিসেবে কাজ করে। কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসারের নকল সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যুগান্তর-এর রিপোর্ট তৈরী করা হয় বলে উল্লিখিত ছিল। এতে আরো বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসার এই রিপোর্ট তৈরী করেছেন। রিপোর্টটিতে কুমিল্লায় নকলের জন্যে বোর্ড চেয়ারম্যানকে দায়ী করে বলা হয়, নকলের জন্য ব্যবহৃত গাইডগুলির প্রকাশকদের সঙ্গেও নকলের জন্যে বোর্ড চেয়ারম্যানকে দায়ী করে বলা হয়, নকলের জন্য ব্যবহৃত গাইডগুলির প্রকাশকদের সঙ্গেও বোর্ড চেয়ারম্যানের সম্পর্ক রয়েছে।

সংবাদপত্রে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শীর্ষক প্রতিবেদন তৈরী কালে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে হোমনার নির্বাহী অফিসারকে নকল সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন পাঠানোর জন্যে বলা হয়নি। তাহলে হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসার কেন এত উৎসাহ ভরে এমন একটি প্রতিবেদন তৈরী করে বোর্ড চেয়ারম্যানের চরিত্র হননে 'যুগান্তর' পত্রিকা পর্যন্ত আসলেন! অনুসন্ধানে আরো দেখা গেছে, হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসারের স্বউদ্যোগে তৈরীকৃত এই প্রতিবেদন আর কোন সংবাদপত্রেও পাঠানো হয়নি, অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি, একমাত্র 'যুগান্তর' ছাড়া।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে নকলের বিরুদ্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনেই একটি কেন্দ্রের (কুমিল্লার নাঙ্গলকোট কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা একটি কলেজের) ৯৩জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯১ জনকেই বহিষ্কার করা হয় (২৮ এপ্রিল

২০০০ তারিখে 'যুগান্তর' পত্রিকাতেই এই সংবাদ প্রকাশিত হয়)। নকলের সুযোগ না পেয়ে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম কলেজে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা ভাংচুর করে। [যুগান্তর ২৮ এপ্রিল ২০০০]।

কুমিল্লার অন্যান্য উপজেলায়ও নকল বিরোধী সাড়াশি অভিযান অব্যাহত ছিল। সংবাদপত্রগুলিতে দেখা যায় কুমিল্লার অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রেই কুমিল্লা বোর্ড থেকে পাঠানো ভিজিল্যান্স টিমের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব ঘটেছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নকল বিরোধী এই অভিযানে রুষ্ট হয়ে পড়েন কুমিল্লার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের নকলবাজ শিক্ষক, অভিভাবক এবং কর্তৃপক্ষ।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, হোমনা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে হোমনা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে যে বিরাট অঙ্কের সম্মানী দেওয়া হয়েছিল, তাতে শেষ কুল রক্ষা হয়নি কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন নকল বিরোধী সাড়াশি অভিযানের কারণে। ফলে প্রশাসনের এই কর্মকর্তা ক্ষুব্ধ হয়ে নকলের জন্য তো বটেই, নকলের ব্যবহারে প্রকাশিত গাইড বইগুলির প্রকাশনার সাথেও সংযোগ পেতে দিয়েছেন কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষের। পরীক্ষায় নকলের দুর্বলতার জন্যে প্রশাসনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ বিশেষ করে আর্থিক সংযোগের যে সীমিত অভিযোগ রয়েছে, কুমিল্লার হোমনা উপজেলার নির্বাহী অফিসারের রিপোর্ট এবং তা থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকাকে বেছে প্রকাশ করার ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্যতার হদিস মেলে। আবার দেখা যাচ্ছে, যে সংবাদপত্র নকলের বিরুদ্ধে এত উল্লাসের সঙ্গে খবর ছেপেছে তাদেরও সংযোগ ঘটেছে এই মাফিয়া চক্রের সাথে।

২৫ মে ২০০০ ভোরের কাগজ এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায় যে, পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে ঢাকা এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিশদ বর্ণনা করে সংবাদপত্রটি লেখে ঃ

কুমিল্লা বোর্ডে চলতি বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করায় নকলবাজ কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সম্মানী পায় প্রশাসনের এমন কিছু কর্মকর্তাও নানা উপায়ে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।..

সম্প্রতি একটি দৈনিকে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে নানা রকম কাল্পনিক তথ্য দিয়ে প্রতিবদন প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। [ভোরের কাগজ, ২৫মে ২০০০]

পরীক্ষায় রাজনৈতিক কর্মীদের ভূমিকা সম্পর্কে সংবাদপত্র

১. দৈনিক ইত্তেফাক ৮মে ২০০০ তারিখে রিপোর্ট করে যে,শেরপুর জেলায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গত বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম এত সুন্দর এবং নকলহীন পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে তার কারণ হল, স্থানীয় ছাত্রনেতাদের অনেকেই কারাগারে দিন কাটাচ্ছে। উপরিউক্ত সংবাদটির মধ্য দিয়ে ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক টাউটদের পরীক্ষায় ভূমিকার বিষয়টি টের পাওয়া যায়। এই শক্তিটি না থাকলে সম্ভবতঃ দেশের সকল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকেই নকল শব্দটিই উঠে যেত।

২. প্রথম আলো পয়লা মে ২০০০ তারিখে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে, রাজশাহীর বেশ কিছু কেন্দ্রে নকলহীন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারছে এই কারণে যে, সেখানে নকলের পক্ষে কারো (রাজনীতিকদের) কোন প্রভাব কার্যকর হচ্ছে না। সরকারি দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সম্মত হলে পরীক্ষায় নকলবাজি নিয়ন্ত্রণে আনা অবশ্যই সম্ভব।

৩. সংবাদ ৩ মে ২০০০ তারিখে এক উপসম্পাদকীয়তে একটি কেন্দ্রের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়। এতে বলা হয়, '(একটি পরীক্ষা কেন্দ্র).. মোটামুটি নিয়ন্ত্রিতই ছিল। হঠাৎ মোবাইল হাতে কয়েকজন ছাত্রনেতা ঢুকে পড়লো। ছাত্ররা সব উঠে দাঁড়ালো। নেতারা বক্তৃতা দিলেন। যার মর্মার্থ-'তোমরা নির্ভয়ে পরীক্ষা দাও, শিক্ষকরা কিছু বলবে না', এরপর থেকে কেন্দ্রের চেহারা আর পূর্বের মত রইল না। অর্থাৎ নকল শুরু হয়ে গেল।

উপসম্পাদকীয়টি পরে উল্লেখ করে, সুষ্ঠু পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা খুব প্রয়োজন।

৪. রাঙ্গুনিয়া ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে নকলে সহযোগিতা করেছেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৫. চট্টগ্রামে মহিলা কলেজে নকলের দাবীতে জামায়াতে ইসলামির স্থানীয় অঙ্গ সংগঠন মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি নামক একটি সংগঠন ভাংচুর চালায়। [প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৬. সোনারগাঁও ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে নকলের খবর পরিবেশন করায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা মনিরুজ্জামান নামে এক সাংবাদিককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। [দৈনিক ইত্তেফকা, ৩মে ২০০০]

৭. দাউদকান্দি (কুমিল্লা) হাসানপুর শহীদ নজরুল ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার খাতা ছিনতাই করতে আসেন কলেজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। পরে তিনি গ্রেফতার হন। [প্রথম আলো, ৩ মে ২০০]

পরীক্ষা-আইনের প্রয়োগ এবং আদালতের অবস্থান

দৈনিক ইত্তিফাক ৩০ এপ্রিল ২০০০ সংখ্যায় অভিযোগ করে যে, পাবলিক নকল বিরোধী আইনের প্রয়োজন নেই। বস্তুত পরীক্ষায় দুর্নীতি প্রতিরোধে অনেক আইন রয়েছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেসব আইনের প্রয়োগ খুব বেশী নেই। তবে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে আইন প্রয়োগের কতকগুলি ঘটনা উল্লেখ করার মতো।

১. রিয়াজউদ্দিন তালাকুদার কলেজে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় আশরাফ আলী নামক এক নকল সরবরাহকারীকে তাৎক্ষণিক সংক্ষিপ্ত আদালত ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে। [ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

২. চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজে নকলের সুযোগ না পেয়ে হামলা চালানোর অভিযোগে ৫ জনকে জননিরাপত্তা আইনে বন্দী করা হয়। [মুক্তকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৩. কুষ্টিয়ায় নকল সরবরাহকারীদের চেহারা চিনে রাখতে পুলিশ ভিডিও ক্যামরো ব্যবহার করে। ফলে মামলার ভয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর ধারে কাছে বহিরাগতরা যায়নি। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৮মে ২০০০, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬মে ২০০০]

কুমিল্লার জুরানপুর আদর্শ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক নকল হতে থাকলে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা চলাকালীনই কেন্দ্রটি বাতিল করে দেন। সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের বিধান শিক্ষা বোর্ডের রয়েছে। এছাড়া, সুষ্ঠু পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্যে নকলের অভিযোগে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল একটি আইনী প্রক্রিয়াও। কিন্তু জুরানপুর কর্তৃপক্ষ নকল দমাতে ব্যঁথ হলেও হাইকোর্ট এসে হাজির হয়। ১০মে হাইকোর্ট কেন্দ্র বাতিলের নির্দেশের বিরুদ্ধে রুলনিশি জারী করে দেয়।

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে আদালতের রায়ের আরো ঘটনা ঘটে। কুমিল্লায় ১৯৯৯ সালে অব্যবস্থাপনা ও ব্যাপক নকলের অভিযোগে ২টি কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছিল, পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তারা পরীক্ষা কেন্দ্র স্থায়ী করে নিয়ে আসে।

আবার মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে কক্সবাজারে একটি নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেন। কিন্তু কক্সবাজার উখিয়া উপজেলার মাদ্রাসা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে কক্সবাজার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা করায় আদালত কক্সবাজার মাদ্রাসার নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে দেন।

মাদ্রাসার পরীক্ষা সম্পর্কে সংবাদপত্র

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭মে ২০০০ সংখ্যায় একটি অভিযোগ উত্থাপন করে বলে যে, মাদ্রাসা পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তার খবর রাখার বা মনিটরিং করার ক্ষেত্রে কারো তাড়া নেই। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেও সব সময় মাদরাসার পরীক্ষার সময় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

বস্তুত একথা সত্য যে, স্কুল-কলেজের পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে যতোটা উত্তেজনা ও হৈ চৈ হয়, মাদরাসার পাবলিক পরীক্ষা সম্পর্কে ঠিক সমানভাবেই থাকে উপেক্ষা, নীরবতা এবং অবহেলা। ফলে মাদরাসা পরীক্ষায় দিনের পর দিন গড়ে উঠেছে একটি অপরাধ চক্র। ধর্ম ভিত্তিক এই পরীক্ষায় যতোটা দুর্নীতি হয়, অন্য কোন পাবলিক পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে ততোটা নয়। পাবলিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের প্রতি 'নজরানা' দেওয়ার যে খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তার বেশীর ভাগটাই ঘটে মাদরাসার পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে।

মাদ্রাসার ছাত্ররা বেশীর ভাগই দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল পাশ করে সমাজে ধর্মনেতা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু এসব পরীক্ষায় মাদরাসার ছাত্ররা শুধু যে অনৈতিক পথই অবলম্বন করে তা নয়, ধর্মীয় বই, বিশেষ করে কোরআন, হাদিস এবং বিভিন্ন ফেকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থ এবং গ্রন্থের পাতা যেভাবে তারা পদদলিত করে, বাথরুম-টয়লেটে ফেলে নকলের জন্যে ব্যবহার করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে তা অকল্পনীয়। এসব ব্যাপারে মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে পাপবোধ তো নেই-ই, বরং উৎসবের সঙ্গেই তারা নকলবাজীর কাজে ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থগুলোর অবমাননা করে থাকে।

১৯৯৮ সালে ঢাকার আলিয়া মাদরাসা, ডেমরার তামিরে মিল্লাত মাদরাসা এবং মোহাম্মদপুরের একটি মাদরাসায় এই ধারার সর্বোচ্চ শ্রেণী কামিল পরীক্ষায় সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা দিতে আসা মাদরাসার ছাত্রদের শতকরা ৯৮ ভাগই নকল করে থাকে। এদের অনেকে পায়ের জুতায় কোরআনের পাতা নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। [এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, মুক্তকণ্ঠ, সংবাদ, ৯জুন ১৯৯৮]

২০০০ সালের আলিম, ফাজিল এবং কামিল পরীক্ষার স্বল্প কয়েকটি কেন্দ্রের চিত্র দেখা যোত পারে ঃ

১. আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার প্রথম দিনে সারাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় নকলের মহোৎসব চলেছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৫মে ২০০০]

২. যশোরে কোরআন মজিদ পরীক্ষায় জাঙ্গিয়ার নীচেও ও বাথরুমে ফেলে নকল করা হয়েছে। দু'জন মাদ্রাসার শিক্ষক নকল সরবরাহের অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়। [প্রথম আলো, সংবাদ ৫মে ২০০০]

৩. গাজীপুর সিনিয়র বেলামী মাদরাসার পরীক্ষার্থীনীরা বোরখার নীচে বই ফেলে নকল করেছে। [ভোরের কাগজ, ৫মে ২০০০]

৪. চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ মাজিদিয়া আলিয়া মাদরাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের দায়ে প্রথম দিনেই ৮০ জন বহিস্কৃত হয়। [ভোরের কাগজ, ৫মে ২০০০]

৫. ময়মনসিংহের আব্বাসিয়া আলিয়া মাদরাসায় টুপীর ভেতরে নকল এনে

লেখার সময় পরীক্ষার্থীরা ধরা পড়ে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৭মে ২০০০]

৬. ১৮টি জেলার ২৯টি মাদরাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে কামিল শ্রেণীর হাদিস পরীক্ষায় নকলের দায়ে ৯২ জন পরীক্ষার্থী বহিস্কৃত হয়। [দৈকিন ইনকিলাব, ৭মে ২০০০]

৭. চট্রগ্রামের রাউজান এফ কে জামিউল উলুম কামিল পরীক্ষা কেন্দ্রে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সামনেই ফ্রি ষ্টাইলে নকল চলে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ১০মে ২০০০]

৮. বরিশাল সাগরদী আলিয়া মাদ্রাসায় আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় দেদারছে নকল চলছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩মে ২০০০]

৯. চাঁদপুর হাজীগঞ্জ দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা এবং ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধ পায়ে ঠেলে এসব কেন্দ্রে মাদ্রাসার ছাত্ররা নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে।...জাঙ্গিয়ার ভেতর থেকে হাদিস ও কোরআনের পাতা বের করে আনে। মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শক বলেছেন, স্কুলের ছাত্রদের যে নৈতিকতা জ্ঞান আছে, মাদ্রাসার ছাত্রদের তাও নেই। [সরেজমিন প্রতিবেদন, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, ভোরের কাগজ, ২৪মে ২০০০]।

২৪মে ২০০০ তারিখে ঢাকার তিনটি জাতীয় দৈনিকে (ইত্তেফাক, সংবাদ ও ভোরের কাগজে) চাঁদপুরের কয়েকটি কলেজ ও কয়েকটি মাদ্রাসার পরীক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে যে সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাতে ঘটনাক্রমে দেখা যায় ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসাটির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন মাওলানা আবদুল মান্নান। মাওলানা মান্নান আবার দৈনিক ইনকিলাব-এরও সত্ত্বাধিকারী। সুতরাং তাদের নিজেদের মাদ্রাসায় নকল হচ্ছে এ খবর যেন তাদের মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। ফলে ২৫মে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা একটি খরব প্রকাশ করে যে চাঁদপুরে কোন নকল হচ্ছে না। ইত্তেফাক, সংবাদ, ভোরের কাগজ প্রকাশিত রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করে দৈনিক ইনকিলাব একই দিন আরো লিখে যে, 'চাঁদপুর হচ্ছে নকলহীন পরীক্ষার একটি মডেল'। [দৈনিক ইনকিলাব, ২৫মে ২০০০]।

বস্তুতঃ দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও ভোরের কাগজ ২৪মে ২০০০ চাঁদপুরের

কলেজগুলিতে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের খরব ঠিকই পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু সংবাদ দাতারা কলেজগুলির পাশাপাশি যখন মাদরাসার পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করতে গেছেন তখনই এই ভয়াবহ ও কুৎসিৎ চিত্র অবলোকন করেছেন।

নকলমুক্ত পরিবেশে দেশের কোথাও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত ২৫মে তারিখের প্রতিবেদনে এই প্রথম স্বীকারোক্তি ঘটেছে। এর আগে দৈনিক ইনকিলাব প্রায় প্রতি দিন এখবরই প্রকাশ করেছে যে, দেশে কোথাও নকল ছাড়া পরীক্ষা অনুষ্ঠিত-হচ্ছে না, দেশ রসাতলে গেল'। দেখুন, দৈনিক ইনকিলাব-এর ৩মে ২০০০ তারিখে খবর, যেখানে লেখা হয়েছে 'দেশ জুড়ে পরীক্ষায় কর্তৃপক্ষ নকলের মহামারী সামান্যতমও রোধ করতে পারেনি'। ৭মে তারিখে দৈনিক ইনকিলাব একটি রঙিন কার্টুনও প্রকাশ করে। এতে শিক্ষামন্ত্রীর কার্টুন করে এটি প্ল্যাকার্ড প্রকাশিত হয় যেখানে লেখা ছিল, 'নকল জাতির মেরুদন্ড'।

অর্থাৎ ২৪মে ইত্তেফাক, ভোরে কাগজ ও সংবাদ-এ চাঁদপুরের মাদরাসা (কলেজের নয়, চাঁদপুরের কলেজগুলিতে সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে বলে একই খবরে তারা প্রকাশ করেছিলেন– পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের খবর প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের অবস্থান ছিল ভিন্ন রকম। ২৪মে-র পর থেকে দৈনিক ইনকিলাব খবর প্রকাশ করতে থাকে যে, দেশের অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে ভাল পরীক্ষাও হচ্ছে। এভাবে নকল সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। তবে মাওলানা মান্নানের ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার নকলের খরব সংবাদপত্রে পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছিল। এই কেন্দ্রে ৫১ জন পরীক্ষার্থী প্রবেশ পত্র চাড়াই পরীক্ষা দিয়েছে এবং প্রথম দিনেই নকলের দায়ে ৮০ জন মাদ্রাসা পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে [দেখুন, ভোরের কাগজ ৫মে ২০০০]। দৈনিক ইনকিলাব ৬মে ২০০০তারিখে এই মাদরাসটিতে ৩০ এপ্রিল এক অনুষ্ঠানে মাওলানা মান্নানের বক্তব্য প্রকাশ করেছিল, যেখানে মাওলানা সাহেব তার মাদরাসার আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার্থীদের নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন। [দেখুন, দৈনিক ইনকিলাব, ৬মে ২০০০]। দৈনিক ইনকিলাব ১৫মে ২০০০ তারিখে জনৈক শাহেদা ওবায়েদ লিখিত একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে শিক্ষকদের নকলের কারণে পরীক্ষার খাতা দেখা বর্জন করারও আহ্বান জানিয়ে উস্কানী দিয়েছিল।

নোটবই, গাইড বইং এবং সংবাদপত্র

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকলের জন্যে ব্যবহৃত গাইড বই, নোট বইয়ের সমালোচনা সংবাদপত্রগুলো করলেও সংবাদপত্র নিজেরাই গাইড বই, নোট বইয়ের পৃষ্টপোষকতা করে থাকে। দেশের অধিকাংশ জাতীয় সংবাদপত্রেই বর্তমানে বিভিন্ন নামে ছাত্রদের গাইড-পাতা, নোট-পাতা নিয়মিত বের কের থাকে। শুধু তাইনা, এসব পাতা যখন নকলের কাজেও ব্যবহার হয়, সংবাদপত্র সে খবরও সন্তোষের সঙ্গে পরিবেশন করে থাকে আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে। গাইড-পাতা ও নোট-পাতার সাজেশন ও সম্ভাব্য উত্তরমালা যে নকলবাজদের কাজে লেগেছে, সে সংবাদ পরিবেশন করে দৈনিক জনকণ্ঠের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি জানিয়েছেনঃ

দৈনিক জনকণ্ঠে নিয়মিত প্রকাশিত 'শিক্ষা সাগরন্ব পাতা নকলের গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হযেছে। শিক্ষা সাগর পাতার এসব কপিতে সম্ভাব্য কয়েকটি রচনা রয়েছে [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০০০]। একদিন অন্য একটি সংবাদপত্র পরীক্ষাকে সামনে রেখে সারাদেশে এক শ্রেনীর অসাধু প্রকাশক নকলে সহায়তাকারী যে সব গাইড ও ক্ষুদ্রাকৃতির নোটবই প্রকাশ করে তার সম্পর্কে সচিত্র রিপোর্ট উপস্থাপন করে। 'টেকনিক গাইড' শিরোনামে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে পপি প্রকাশনা ও আরিফ প্রকাশনী নামে দুইটি প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত নকল-সহায়ক পুস্তিকার কথা উল্লেখ করে বলা হয়ঃ

মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির পাশাপাশি নকলপ্রবণ এলাকাগুলোতে পরীক্ষার্থী, ফটোকপির ব্যবসা আর 'টেকনিক গাইড' বিক্রেতাদের কাজ চলছে একযোগে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে সারাদেশে শুরু হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত খবর, কিছু অসৎ শিক্ষকের সাহায্যে অসাধু ব্যবসায়ী নকলে সহায়ক বিশেষ ধরনের গাইড বই প্রকাশ করে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বইয়ের দোকানগুলোতে সরবরাহ করছে। টেকনিক গাইড, ম্যাজিক গাইড, বুলেট গাইড-ইত্যাদি বাহারি নামের এ গাইডগুলোর আকৃতি সাধারণত পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এবং পৌনে চার ইঞ্চি চওড়া। পরীক্ষার হলে বহনের সুবিধার্থে গাইডগুলো এ সাইজের করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও ছোট সাইজেরও হয়। এসএসসি, এইচএসসিসহ বিভিন্ন পরীক্ষার সময় মফস্বল এলাকায় সব

বিষয়ের ওপর লেখা এ গাইডগুলো বিক্রির ধুম পড়ে যায়। নকলে নির্ভরশীল পরীক্ষার্থীদের মাঝে এর সমাদর যথেষ্ট। [যুগান্তর, ২০ এপ্রিল ২০০০]।

২৪ এপ্রিল বাংলাবাজার পত্রিকা এবং ২৫ এপ্রিল ভোরের কাগজও নকল সহায়ক পকেট সাইজ বিভিন্ন গাইড দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিক্রি হওয়ার খরব প্রকাশ করে। ভোরের কাগজ টেকনিক গাইড এর পাশাপাশি ম্যাজিক গাইড, বুলেট গাইড ইত্যাদির খবর দিয়ে জানায়, এদের আকৃতি সাড়ে চার ইঞ্চি বাই সাড়ে তিন ইঞ্চি মাপের। প্রতিটি গাইড বিক্রি হয় ৬০ থেকে ১০০টাকায়। ফটোষ্ট্যাট দোকানগুলো নোটবই ছোট করে প্রীন্ট করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে বলে রিপোর্টগুলোতে উল্লেখ করা হয় [ভোরের কাগজ ২৫ এপ্রিল ২০০০এবং বাংলাবাজার পত্রিকা ২৪ এপ্রিল ২০০০]। পাবলিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে সমাজ বিরোধী প্রকাশনা সংস্থাগুলো যে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় তার সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকও রিপোর্ট করেঃ দুইপক্ষই যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া দিয়াছে। বোর্ডের পরীক্ষা যে কোন মূল্যে নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করা হবে-এই সংকল্পের কথা ঘোষণা করিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড। কিন্তু এই ব্যাপারে নকল সরবরাহকারীদের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া, ভয়-ভীতি লক্ষ্য করা যাইতেছে না। নকলের জন্য বাহির হইয়াছে নানা টেকনিক। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নোট বই। বিভিন্ন নামে ইহা বাজারজাত হইতেছে। অভিভাবকদের সামনেই ছাত্র-ছাত্রীরা এইসব গাইড বই কিনিতেছে। এইচএসসি পরীক্ষার হলে নকলের জন্য বরিশালে বাহির হইয়াছে বাহারী রকমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নোট বই। বিভিন্ন নামে ইহা বাজারজাত হইয়াছে। গ্যারান্টি গাইড, কনসেন্ট, টেকনিক, কমন হ্যান্ডনোট ইত্যাদি বাহারী নামে এইগুলি নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছিয়াছে।

গোয়েন্দা পুলিশ ২৫ এপ্রিল মঙ্গলবার বরিশাল শহরের লাইন রোডের ষ্টার লাইব্রেরীতে হানা দিয়া ১৮৪ খানা এই ধরনের গাইড উদ্ধার ও বিক্রেতা রফিককে গ্রেফতার করে। প্রতিটি গাইডের সাইজ হইতেছে দৈর্ঘ্যে ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৩ ইঞ্চি [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ এপ্রিল ২০০০]। বস্তুতঃ বরিশালের পুলিশের মতো এমন তৎপরতার অভাবেই প্রতিবছর সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়তো ভাবতেই পারে না, এভাবে দেশের ভেতরে অসাধু একটা বড় ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

আবার সংবাদপত্র নকলে ব্যবহৃত গাইড বই, নোট বইয়ের সমালোচনা করলেও এসব গাইডবই, নোট বইয়ের বিজ্ঞাপন তারাই প্রকাশ করে ছাত্রদের সামনে পরিচিত করে দেয়। এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র যুক্তি তুলতে পারে যে, টাকার জন্যে তারা বিজ্ঞাপন ছেপে থাকেন। টাকাই যদি ব্যাপার হয়,তাহলে টাকার জন্যেই যেসব দুর্নীতি দেশে হয় তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের দাঁড়ানোর নৈতিক জোর থাকে কোথায়! দেশের সরকার নিয়ন্ত্রনাধীণ ইলেকট্রোনিক মিডিয়া বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই রয়েছে। কিন্তু টাকা দিয়ে কেউ বাংলাদেশ টেলিভিশনে সিগারেটের বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন না। কিন্তু সিগারেটের চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতির শিক্ষা বিনাশী গাইড বই, নোট বইয়ের বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রে তা, টাকা দিয়ে ছাপানো সম্ভব হচ্ছে। সংবাপত্র হয়তো কোনদিনই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যে, তারা পরীক্ষায় নকলের সরঞ্জাম গাইডবই, নোটবইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপবে না।

এসব গাইড বই, নোট বইয়ের বিজ্ঞাপনের দু'একটি নমুনাও এ প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে ঃ

প্রশ্নপত্র ফাঁস
ইংরেজি দুই পেপার

SSC-2001

SSC-2001 প্রশ্নপত্র ফাঁস!!

কেমন হতো যদি পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র পাওয়া যেত অথচ তা বে-আইনী না হতো। তাহলে তো আতে চাঁদ পাওয়া যেত, নয় কি? কর্তৃপক্ষ Communicative Syllabus -এর মানবন্টনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন। সেই আলোকে পুরা ২০০ Cover নম্বর করে বের হয়েছে **Model Test Best Quality Sample Questions & Answers** by-Sekendar Ali প্রথম পত্রের পাঠ্য (Textbook)বই -এর সবগুলো Lesson থেকেই Comprehenison-এর প্রশ্ন করা হয়েছে। সর্বশেষ Model অনুসারে প্রশ্নগুলিকে সাজানো হয়েছে। বইটি সংগ্রহ করুন। কিছুই আর গোপন নেই।

প্রাপ্তিস্থান আল-হেলাল পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনটি সংগ্রহ করা হয়েছে দৈনিক মানবজমিন এবং যুগান্তর-এর ৯ মে ২০০০ সংখ্যা থেকে। এই বিজ্ঞাপনটি শুধু দৈনিক যুগান্তর ও মানবজমিনেই নয়, প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার প্রায় সকল জাতীয় দৈনিকেই। এ সময় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও চলছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে দেশে পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে না। প্রতি বছরই প্রশ্নপত্র ফাঁস হতো একথা এখন জনগণ ভুলেও গিয়েছে। সেই 'প্রশ্নপত্র ফাঁস' শিরোনাম করে উল্লাসের সঙ্গে বিজ্ঞাপন আবার পরীক্ষা চলাকালীন কতোটা ভয়াবহ ও অপরাধের তা নিরূপণ করাও কঠিন। বোঝা যায়, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ন্যূনতম ethics-ও মেনে চলা হচ্ছে না।

আরো দু'টি বিজ্ঞাপন-চিত্র দেখা যেতে পারে ঃ

১.

পপি লাইব্রেরী! পপি লাইব্রেরী!!

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, তোমরা অবগত আছো যে, ২০০১ সালের এস. এস. সি ইংরেজি পরীক্ষা নতুন সিলেবাস তথা Communicative System-এ হতে যাচ্ছে। এই System-এ কি ধরনের প্রশ্নপত্র হবে তা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, চাহিদা ও নির্ভরতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট গবেষনা করেছি। নতুন সিলেবাস, মানবন্টন ও প্রশ্নপত্রের ধারার আলোকে আমাদের এ গবষণার সোনালী ফসল পপি English গাইড (প্রথম পত্র দ্বিতীয়) আগামী ২৪-৬-২০০০ইং রোজ শনিবার বের হতে যাচ্ছে। বাইটি ছাত্র/ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমরা আশাবাদী।

-ব্যবস্থাপক

২.

পপি লাইব্রেরী! পপি লাইব্রেরী!!

লেখক ও সম্পাদক আবশ্যক

স্বনামধ্যন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পপি লাইব্রেরীর প্রকাশনা শাখার জন্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা কাজে কিছু সংখ্যক যোগ্য ও মেধাবী লোক (ফুল টাইম/পার্ট টাইম) নিয়োগ করা হবে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তিধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও স্বহস্তে লিখিত দরখাস্তসহ নিম্ন ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করতে বলা যাচ্ছে।

ব্যবস্থাপক
পপি লাইব্রেরী
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন ঃ ৭১২২০৭৩ (অফিস),
৭১১৪৩৫৮

উপরোক্ত দু'টির প্রথমটি 'যুগান্তর' ২০ জুন ২০০০ এবং দ্বিতীয়টি দৈনিক ইত্তেফাক-এর ২১জুন ২০০০ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

পরীক্ষার সময় এই পপির গাইডের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলো ছিল সোচ্চার, এদের নানারকম গাইড পরীক্ষায় নকলের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অথচ সংবাদপত্র এদের বিজ্ঞাপন টাকার বিনিময়ে ছেপেছে, তাহলে এদের বিরুদ্ধে লেখার নৈতিক শক্তি সংবাদপত্রের থাকে কোথায়! সংবাদপত্রগুলোর কি কোনই দায়িত্ব নেই!

নকলের বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংবাদপত্রের 'সৃজনশীলতা' আবিষ্কার

নকলবাজ ছাত্ররা পরীক্ষায় নকলের জন্যে নোটবই, গাইড বইয়ের বাইরেও নানারকম পদ্ধতি ও উপাদান ব্যবহার করে থাকে। হাতের মধ্যে লিখে আনা থেকে শুরু করে বেঞ্চে, কাগজে ইত্যাদি নানারকমভাবে নকলের কাজে ব্যবহার করে থাকে। কোন কোন সংবাদপত্র এসব অপকর্মের পদ্ধতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে উঁচু মানের সৃজনশীলতা। একটি দৈনিক 'নকল: বিচিত্র সব পদ্ধতি'

শীর্ষক শিরোনামে লিখেছে ঃ এইচএসসি পরীক্ষায় নকল চলছে বিচিত্র সব পদ্ধতিতে। এসব পদ্ধতি কৌতুকপ্রদ হলেও সৃজনশীলতার দিক থেকে উঁচু মানের। [যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

নকলের খবর প্রকাশে সংবাদপত্রের আন্তঃদ্বন্দ্ব

সারাদেশে পরীক্ষায় নকলের খবর প্রকাশ ও প্রচারে সংবাদপত্রের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়। কে কত বেশী সংখ্যক কেন্দ্রের নকলের খবর প্রকাশ করতে পারে, কত বড় হেডিং দিয়ে তার শিরোনাম করবে। তার একটি সুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকল সময়ই চলে। কোন কোন সংবাদপত্র কোন কেন্দ্রে নকল না হলেও নকল বিরোধী এ্যাকশনকেই এমন শিরোনাম করে তোলে যে, মনে হয় কেন্দ্রটি নকলবাজদের নিয়ন্ত্রণেই চলে গেছে। কোন কোন সংবাদপত্রের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমন করার উদ্দেশ্যেও নকলের খবর প্রচারের অতি উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। ফলে নকলের প্রকৃত চিত্রের সঙ্গে সংবাদত্রের প্রকাশিত চিত্রের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে। যেমন,

১. মুক্তকণ্ঠ, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, বাংলাবাজার পত্রিকা, দৈনিক মানবজমিন প্রভৃতি সংবাদপত্র পয়লা মে ২০০০ এই খবর প্রকাশ করে যে,সারাদেশে পূর্বের তুলনায় নকল প্রবণতা কমে এসেছে। নকল প্রবণতা কমে যাওয়ায় অপ্রীতিকর ঘটনাও কম ঘটেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করায় ব্যাপক হারে নকল কমেছে। দৈনিক ইত্তেফাকও ৪ মে এবং ৮ মে খুলনা ও শেরপুরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর চিত্র তুলে ধরে বলে 'নকলের ভূস্বর্গ' বলে পরিচিত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এমন সুন্দর পরিবেশে আর কোন সময় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ ১৬মে ২০০০বলে, আসন বিনিময় ব্যবস্থা ঢাকা ও যশোর বোর্ডে পূর্ণাঙ্গ এবং চট্টগ্রামে আংশিকভাবে কার্যকর করা সফল হওয়ায় ছাত্রদের মাঝে নকল করার প্রবণতা ও সুযোগ কমে গেছে। কিন্তু যুগান্তর এবং দৈনিক ইনকিলাব পরীক্ষার প্রথমদিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত দাবী করে

এসেছে নকলে দেশ ভেসে গেছে। ৭মে ২০০০তারিখে যুগান্তর লেখে, 'নকল এবার আগের চেয়ে কমেনি বরং বেড়েছে'। দৈনিক ইনকিলাবও অনুরূপ মন্তব্য করে ৩মে ২০০০ তারিখে পত্রিকাটি লেখে, দেশ জুড়ে পরীক্ষায় নকলের মহামারী কর্তৃপক্ষ সামান্যতমও রোধ করতে পারেনি।

২. পাবলিক পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ও দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রশ্নপত্রের ধরণ পাল্টানোর দাবী ছিল দীর্ঘ দিনের। সংবাদপত্রগুলো দীর্ঘদিন থেকেই এনিয়ে প্রচুর নিবন্ধ, মতামত ও খবর প্রকাশ করে আসছিল। পরীক্ষা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদরা বলেছিলেন, এমন প্রশ্নপত্রই করা উচিৎ যাতে লেখাপড়া করা না থাকলে বই খুলে নকল করার সুযোগ থাকলেও প্রকৃত উত্তর লিখতে ব্যর্থ হয়।

১৯৯৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের সভাপতিত্বে শিক্ষাবোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী পরীক্ষাগুলাতে প্রশ্নপত্রের ধরণ হবে বিশ্লেষণাত্বক এবং গণিতের প্রশ্নে সংখ্যা বা ডিজিট পরিবর্তন করে দেওয়া হবে যাতে লেখাপড়া যারা করে তারাই পরীক্ষায় পাশ করতে পারে। [এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, মুক্তকণ্ঠ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯]।

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, সমস্ত স্কুল-কলেজে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কর্মশালা করে প্রশ্নকর্তাদেরও গতানুগতিক প্রশ্ন না করে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশ্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সংবাদ-এর ৪মে ২০০০ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে একটি লেখা প্রকাশিত হয়, যেখানে দাবী করা হয়, পরীক্ষা প্রশ্নপত্র নতুন আঙ্গিকে করার কথা ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন আঙ্গিকে প্রশ্নপত্র করা হয়েছিল কিনা তার উত্তর পাওয়া যায় যুগান্তর ১২ জুন ২০০০ সংখ্যার অভিযোগের মধ্যেই। এদিন 'যে কারণে এত ফেল' শিরোনামে 'যুগান্তর' পত্রিকা বিভিন্ন জনের মত প্রকাশের সূত্রে সংবাদপত্রটি

নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, নতুন সিলেবাস নতুন ধারার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে পারেনি। প্রশ্নে অঙ্কের ডিজিট পরিবর্তন করে দেয়াই ফেল করার প্রধান কারণ। [যুগান্তর, ১২ জুন ২০০০]

কেন সংবাদপত্রে নকল বিষয়ক খবরে অতিরঞ্জন

সাধারণভাবে সংবাদপত্রগুলো মনে করে দুর্নীতি, ভাংচুর, গন্ডগোল, রাহাজানি, খুন, সন্ত্রাসের খবর বেশী করে থাকলে পাঠকের কাছে সংবাদপত্রের কদর বাড়ে। দেশে যদি শান্তি-শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে এবং কোন প্রকার নেতিবাচক খবর না থাকে তাহলে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো খুব বেশী খবরের খড়ায় পতিত হবে, অন্তত যেভাবে সংবাদপত্রগুলো এদেশে বেড়ে উঠেছে তার ভিত্তিতে একথা নির্দ্ধিধায় বলা চলে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক পক্ষ রয়েছে। বাংলাদেশের এমন একটি সংবাদপত্র নেই, যার নিজস্ব কোন রাজনৈতিক লাইন নেই। ফলে প্রতিটি সংবাদপত্র সংবাদ চয়নে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে 'ট্রিটমেন্ট' করে থাকে এবং সেভাবেই তার প্রতিপক্ষের নেতিবাচক দিকগুলো আরো অতিরঞ্জন করেই প্রকাশ করে থাকে। সংবাদপত্রগুলোর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ও রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দের মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তি বিশেষকে সমাজে হেয় এবং ব্যর্থ বলে পরিচিত করে তুলতেও অনেক সময় সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ নিজ প্রতিবেদককে বিশেষ 'এসাইনমেন্ট' দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে-সংবাদপত্রের জন্যে এটা কোন খবর নয়। পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি (না থাকলেও) কোন সংবাদপত্র উৎসাহ ভরে লিখে দিয়েছেন 'পরীক্ষা পদ্ধতি শেষ হয়ে গেল'। ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অন্যান্য বারের তুলনায় জনমত এবং প্রতিরোধ নকলের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাজে দেওয়ায় নকল কমে এসেছিল। দু'একটি সংবাদপত্র মনে করেছেন সত্য মেনে নিলে তাদের নৈতিক পরাজয় ঘটবে। ফলে প্রায় সকল জাতীয় সংবাদপত্রে নকল প্রবণতা কমে আসার খবর

প্রকাশিত হলেও যুগান্তর এবং দৈনিক ইনকিলাব তার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে।

সংবাদপত্রের পাতায় সুপারিশমালা

২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে সংবাদপত্রের পাতায় বিভিন্ন সূত্রে, নিবন্ধে সাক্ষাৎকারে, নানারকম সুপারিশই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু সুপারিশ বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, কিছু অবাস্তব এবং কৌতুককর সুপরিশও রয়েছে ঃ

১. পাবলিক পরীক্ষায় ইংরেজী পত্রের পরীক্ষা সকল বিষয়ের শেষে অনুষ্ঠিত হলে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকবে। [সংবাদ, ৯মে ২০০০]

২. নকল বন্ধ করার জন্যে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা ভর্তির পূর্বানুমতি বন্ধ করে দিতে হবে। [প্রথম আলো, ১০মে ২০০০]

৩. নকলকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে মিডিয়াকে বাহুল্যতা বর্জন করতে হবে। নকলের 'মহোৎসব' সর্বাংশে সঠিক নয়। [দৈনিক মানব জমিন, ২৯ এপ্রিল ২০০০]

৪. পরীক্ষায় নকল বিরোধী আইনগুলোর প্রয়োগ জরুরী হয়ে পড়েছে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৫. স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও প্রশাসনিক দুর্বলতাই নকলের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দুর্বলতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল ২০০০]

৬. পরীক্ষা কেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রভাব কমালেই নকলমুক্ত পরিবেশ সম্ভব। [প্রথম আলো, পয়লা মে ২০০০]

৭. শিক্ষকদের পেশাগত দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই, তা আনতে হবে। [সংবাদ,৩মে ২০০০]

৮. সাহসী এবং নীতিবান শিক্ষককে আগে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩মে ২০০০]

৯. আসন বিনিময় ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৪মে ২০০০, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ এপ্রিল, ১৬ মে ২০০০]

১০. নকল সরবরাহকারী এবং সহায়তাকারী শিক্ষকদের শাস্তি কার্যকর করা প্রয়োজন। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৫মে ২০০০]

১১. পরীক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। [দৈনিক সংগ্রাম, ৬মে ২০০০]

১২. মাদ্রাসা পরীক্ষায় মনিটরিং ও ভিজিল্যান্স আরো বাড়ানো প্রয়োজন [দৈনিক ইত্তেফাক, ৭মে ২০০০]।

১৩. নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া যাবে না [যুগান্তর, ৭মে ২০০০]।

১৪. শিক্ষক-ছাত্রদের নিয়মিত ক্লাশ করা নিশ্চিত করতে হবে। [যুগান্তর, ৭মে ২০০০]

১৫. অবসরপ্রাপ্ত এবং অবসরগ্রহণ ছুটিরত শিক্ষকদের দিয়ে পরীক্ষায় আরো ভিজিল্যান্স টিম গঠন কার্যকর করা প্রয়োজন। [দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭মে ২০০০]

১৬. পাবলিক পরীক্ষার সময় স্থানীয় রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতাদের জেলে রাখলে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৮মে ২০০০]

১৭. বহিরাগত নকল সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করে মামলা দায়েরের জন্য ওদের ভিডিও ক্যামেরা বন্দী করে রাখা প্রয়োজন। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৮মে ২০০০]

পরীক্ষার ফলাফল ও মূল্যায়ন

২০০০ সালের ২৬ আগষ্ট শনিবার একযোগে দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। সংশ্লিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ ২৫ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এই ফলাফল তুলে দেন।

২০০০ সালের এপ্রিল-মে মাসে সারা দেশে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ৫ লাখ ২ হাজার ৯২৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে পাস করে ১ লাখ ৮৬ হাজার ২৩৪ জন এবং সারা দেশের গড় পাসের হার ছিল ৩৭ দশকি ০৩ ভাগ। ১৯৯৯ সালে সারা দেশের গড় পাসের হার ছিল ৫৩ দশমিক ৪০ ভাগ।

২০০০ সালে সর্বোচ্চ পাসের হার কুমিল্লা বোর্ডে ছিল ৪০ দশমিক ৩৮ ভাগ, আর সর্বনিম্ন ঢাকা বোর্ডে ৩৫ দশমিক ৩৮ ভাগ। যথারীতি ২০০০ সালেও মেয়েদের দ্বিগুণ ছেলে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। তবে অংশগ্রহণে পিছিয়ে থাকলেও পাসের হারে এগিয়ে ছিল মেয়েরাই। ২০০০ সালে মোট ৩ লাখ ১৫ হাজার ৪৫ জন ছেলে পরীক্ষায় অংশ নেয়, এদের মধ্যে পাস করে ১ লাখ ১০ হাজার ২৮৯ জন। ছেলেদের গড় পাসেরহার ৩৫ ভাগ। অন্যদিকে ১ লাভ ৮৭ হাজার ৮৯১ জন মেয়ে অংশ নিয়ে পাস করে ৭৫ হাজার ৯৪৫ জন। মেয়েদের গড় পাসের হার ৪০ দশমিক ৪২ ভাগ।

২০০০সালের এসএসসি পরীক্ষায় সারা দেশে তিন বিভাগে মেয়েরা শীর্ষস্থান অধিকার করলেও এইচএসসিতে শীর্ষ তিনজনই ছেলে এবং শীর্ষ তিনজনই যশোর বোর্ডের। বিজ্ঞান বিভাগে সারা দেশে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক, তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯৫৯। আর মানবিকে সারাদেশে সবচেয়ে বেশি ৯৩৩ নম্বর পায় ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মীর নাহিদ মাহমুদ। বাণিজ্যে ৯০৪ নম্বর পেয়ে সবার শীর্ষে ছিল মোহাম্মদ কুদরতউল্লাহ। সে বরিশাল অমৃতলাল দে কলেজের ছাত্র।

পাসের হারে এগিয়ে থাকলেও মেয়েরা ২০০০ সালের এইচএসসি -তে মেধা তালিকায় বেশ পিছিয়ে। তিন বিভাগে ৫ বোর্ডর মোট ১৫টি সম্মিলিত মেধা তালিকায় মাত্র তিনটির শুরুতে ছিল মেয়েদের নাম। ৮৭৭ নম্বর পেয়ে ঢাকা বোর্ডে মানবিক বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের ছাত্রী জুরানা আজিজ ৮১৩ নম্বর পেয়ে চট্টগ্রাম বোর্ডে মানবিক বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম চট্টগ্রাম কলেজের নিশাত সুলতানা ৮৩২ নম্বর নিয়ে চট্টগ্রাম বোর্ডেরই বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা

তালিকায় সবাইকে ছাড়িয়েছিল ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের মাহবুবুল লিমা।

বিপর্যয়ের বড়ো কারণ যত্ন নিয়ে পাঠদান না করা

এইচএসসি পরীক্ষায় ৩ লাখেরও বেশি পরীক্ষার্থী পাস না করায় শিক্ষকরা নিজেদেরই দায়ী করেছেন। এ বিষয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন (ভোরের কাগজ-এর ২৮ আগষ্ট ২০০০ তারিখে) প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়ঃ

কলেজে আগের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের যত্ন নিয়ে পাঠদান করা হয় না। পাশাপাশি শিক্ষকরা ফল বিপর্যয়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকাও অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অধিকাংশ কলেজে পড়াশোনার পরিবর্তে ছাত্রভর্তি আর পরীক্ষার ফরম পূরনের ব্যবসা করা হয় বলেও শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। রাজধানী ঢাকার কয়েকটি কলেজের বেশ কজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললে তারা এইচএসসির ফল বিপর্যয় সম্পর্কে এই অভিমত দেন।... এতো অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ফেল কারা সংবাদে গতকাল (২৭ আগষ্ট) সারা দেশে এইচএসসি পরীক্ষার্থী এবং কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। অভিভাবক মহলও শঙ্কিত। শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা হোসনে আরা শাহেদ মনে করেন, ক্লাসে পড়াশোনা হয় না বলেই ছাত্র-ছাত্রীরা ফেল করছে। তিনি এ জন্য শিক্ষকদের দীয় করে বলেন, দুর্বল প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে ক্লাসে যত্ন নিয়ে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট আর কোচিং নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন তারা। কলেজগুলোর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কলেজগুলো এখন পোস্ট অফিসে পরিণত হয়েছে। যেখানে আসলে সহজেই পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার রেজিষ্ট্রেশন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে আসার চেয়ে তাই বাড়ীর কাছে কোচিং-এ যেতে বেশি আগ্রহী।

খিলগাঁও মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ বদিউজ্জামানও একই অভিযোগ তুলে বলেন, পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য শ্রেণীকক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগ উপস্থিত থাকার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তা কোথাও মেনে চলা হয় না। তিনি এ জন্য বর্তমান আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে দায়ি করে বলেন, ছাত্র

ছাত্রীদের অনুকূলে এখন কিছুই নেই। তবে সবকিছুর পরও তিনি শিক্ষকদের দোষ দিয়ে বলেছেন, শিক্ষার্থীকে তৈরি করার দায়িত্ব একজন শিক্ষকের এবং সেখানেই শিক্ষকরা চরমভাবে ব্যর্থ।

সিদ্ধেশ্বরী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শামসে আরা মনে করেন, নতুন সিলেবাস হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা এবার বাছাই করে পড়াশোনার সুযোগ কম পেয়েছে। কারণ তাদের সামনে আগের বছরের প্রশ্ন বাদ দেওয়ার কিছু ছিল না। এ ছাড়া প্রশ্নপ্রত্রের ধরণ পাল্টে যাওয়ায়ও তারা অসুবিধায় পড়েছে। ৩ লাখ পরীক্ষার্থী ফেল করার জন্য শিক্ষকদের দায়ী করে তিনি বলেন, যত্ন নিয়ে শিক্ষকরা ক্লাস নিলে এমন বিপর্যয় হতো না। শিক্ষকরা কলেজে পড়াশোনা উন্নত করার জন্য কলেজ প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, ক্লাসে যাতে শিক্ষকরা যত্ন নিয়ে পড়ান এবং ছাত্র ছাত্রীরাও যাতে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হয় সেদিকটা কলেজ প্রশাসনকে দেখতে হবে। পাশাপাশি সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের। [ভোরের কাগজ, ২৮ আগষ্ট ২০০০]।

ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক, তবে উপায়ও ছিল না

দৈনিক মাবন জমিন এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখে মন্তব্য করে বলেনঃ

...ফলাফল নিয়ে একটা আশঙ্কা শুরু থেকেই ছিল। যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় এই ফলাফলকে বিপর্যয় বলা যায় কিন্তু পরীক্ষাগুলো যে পরিস্থিতিতে হয়েছে তাতে এমন ফলাফলই বাঞ্চনীয়। নকল করলেই যে পাস করা যায় না-এটা ছাত্র ছাত্রীরা এবার বুঝতে পারবে নিশ্চয়। ফলাফল যদিও হতাশাব্যঞ্জক কিন্তু এছাড়া তো উপায় ছিল না।

একটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ জরুরী ঃ শহরের মুষ্টিমেয় স্কুল, কলেজ ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো এবং মফস্বলের কলেজগুল্যের ফলাফল খুবই খারাপ। এটা মেনে নেয়া যাচ্ছে না। শুধু শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে দোষ চাপানো ঠিক নয়, কলেজগুলোতে নিয়মিত ক্লাস হয় না। যথাসময়ে সিলেবাস শেষ হয় না, বিশেষ করে ছাত্ররা দলীয় রাজনীতির প্রতি অত্যধিক ঝুঁকে পড়েছে মফস্বলের

কলেজগুলোতে। সেই সাথে এক শ্রেণীর শিক্ষক দলীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের ইন্ধন যোগাচ্ছে এবং শিক্ষকরাও রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত। পড়াশেনার চেয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড বেশি হচ্ছে কলেজগুলোতে, এর সাথে আছে প্রাইভেট কোচিং দেবার প্রবণতা। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে ক্লাস নেবার চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করেন বাসায় পড়াতে। যারা প্রাইভেট কোচিং নেবার সুযোগ পায় না তাদের জন্য সমস্যা হয় একটু অন্য কারণে। এবার নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। এই পদ্ধতিটি অনেক ছাত্রছাত্রীই বুঝতে পারেনি। শিক্ষকদের দায়িত্ব ছিল সেটা বুঝিয়ে দেয়া। অমরা এটাকে বিপর্যয় বলব না, আমরা বলবো সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভয়াবহ চিত্র এটি। এই ফলাফল আগামীতে সচেতন করবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী অভিভাববক সবাইকে [দৈনিক মাবন জমিন, ২৮ আগষ্ট ২০০০]।

এ বিপর্যয়ের প্রয়োজন ছিল

দৈনিক ইত্তেফাকও এ সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়ঃ

এসএসসি'র মত এইচএসসি পরীক্ষান্তেও ফল বিপর্যয় ঘটায় বিভিন্ন মহলের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় পাসের গড় হার ছিল ৪০ দশমিক ৩৬। এইচএসসিতে পাসের গড় হার দাড়াইয়াছে ৩৭ দশমিক ০৩। অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষায় শতকরা ৬০জন এবং এইচএসসি পরীক্ষায় শতকরা ৬৩জন ছাত্র-ছাত্রী ফেল করিয়াছে। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে কেন এই বিপর্যয়? একটানা ১০ বছর অথবা ১২ বছর পড়াশুনা করিয়া বোর্ডের পরীক্ষায় যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করে তাহা হইলে দেশে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কি? শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, দেশের বিভিন্ন স্থানে গুটিকয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঠিকমত লেখাপড়া হয় কিনা, তাহার জবাবদিহিতাও নাই। উপরন্তু এইবার পরীক্ষায় নকলের সুযোগ কমিয়া যাওয়ায় ফল বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তিনি বলেন, পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় মানেই জাতীয় সম্পদের অপচয়। দেশের স্বার্থেই

এ অপচয় কখনই কাম্য হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস এবারের বিপর্যয় শিক্ষার মান উন্নয়নে ভবিষ্যতে ভূমিকা রাখিবে। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী হইবে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবীদরাও একই মন্তব্য করিয়াছেন।

...এত স্বল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করার কারণে প্রতিষ্ঠানের পড়াশুনার মান, লেখাপড়ার পরিবেশ, সর্বোপরি শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান দুরবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। সূত্রগুলির মতে, দেশের শহর এলাকার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী লেখাপড়া হয় না। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমন্বিত ব্যবস্থা নাই।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনেকেই শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানে তেমন পারদর্শী নন। নোট বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইলেও স্কুল-কলেজ মাদ্রাসার অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেরাই নোট বই পড়িয়া শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান করেন। প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মিছিল-মিটিং করিয়া সময় কাটানোর প্রবণতা বেশী। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের কারণে কখনও কখনও শিক্ষক, ছাত্র নেতা কোন ঘোষণা ছাড়াই নির্ধারিত ক্লাসে হাজির থাকে না।

অন্যদিকে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একদল ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত ক্লাস করার চাইতে নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে মিছিল-মিটিংয়ের কাজে বেশী ব্যস্ত থাকে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত টেস্ট-প্রিটেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ক্লাসে হাজিরার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রহিয়াছে। অধিকাংশ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ক্লাসে হাজিরার বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। অনেকে সারা বছর ক্লাসে অনুপস্থিত থাকিয়াও বোর্ডের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পান। কোথাও কোথাও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় নকলের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্বস নামিয়াছে।... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর একে অজাদ চৌধুরী বলিয়াছেন, এই বিপর্যয়ের প্রয়োজন ছিল। এখন নিশ্চয়ই ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝিতে পারিয়াছে পড়াশুনার কোন বিকল্প নাই। না পড়িলে পরীক্ষায় পাস করা

যাইবে না। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর এটিএম শরীফউল্লাহ বলেন, শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত লেখাপড়া হয় নাই বলিয়া এসএসসি ও এইচএসসিতে ফল বিপর্যয়। আমাদেরকে শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতন করিয়া তুলিবে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব প্রফেসর কাজী ফারুক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জবাবদিহিতার পরিবেশ নিশ্চিত না হইলে এই ধরণের বিপর্যয় রোধ করা যাইবে না। শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের আন্তরিকতার পাশাপাশি সরকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতাও তিনি কামনা করেন।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, ২৩শে আগষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সহিত শিক্ষামন্ত্রীর যৌথ বৈঠকে যে সমঝোতা স্মারক প্রস্তুত করা হইয়াছে উহার প্রতিটি দফা কার্যকর হইলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে। সমঝোতা স্মারকের সিদ্ধান্তসমূহ যথাক্রমেঃ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র-ছাত্রী থাকিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীর হ্রাস পাইলে আনুপাতিক হারে এমপিওভুক্ত শিক্ষক হ্রাস পাইবে। প্রত্যেক শিক্ষক নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত পিরিয়ড/ক্লাস (টিউটোরিয়ালসহ) নিবেন। স্বীকৃতি প্রাপ্তির নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও পাসের হার নিশ্চিত করিতে হইবে। ২০০৪ সালের মধ্যে অগ্রগতির হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। নকলমুক্ত অবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষক সমাজ সচেষ্ট থাকিবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক পরীক্ষায় নকলে সহায়তা করিলে সংশ্লিষ্ঠ শিক্ষকের বেতনের সরকারী অংশ বন্ধ করা হইবে এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রে নকল হইবে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা হইবে। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন বিশেষ কমিটি থাকিবে না। নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত কোন প্রার্থী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হইবে না [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ আগষ্ট ২০০০]।

কলেজ শিক্ষকদের মূল্যায়ন

ব্যাপক হারে ছাত্র-ছাত্রীদের ফেলের লজ্জা গোটা শিক্ষক সমাজের। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বিপর্যয় শীর্ষক এক মুক্ত আলোচনায় (২৯ আগষ্ট ২০০০

তারিখে) শিক্ষকগণই বলেন, ব্যাপকহারে ছাত্রছাত্রীদের ফেলের লজ্জা গোটা শিক্ষক সমাজের। তারা বলেন, নতুন সিলেবাসের জন্য ছাত্রছাত্রীরা পাশ করেনি, এটি কোন যুক্তি হতে পারে না। মূলত বেশির ভাগ শিক্ষকই ক্লাসে ঠিকমতো পড়ান না। অন্যদিকে আলোচনায় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, বর্তমানে প্রাইভেট না পড়লে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকরা নজর দেন না।

ঢাকায় বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এই মুক্ত আলোচনায় এক প্রস্তাবে বলা হয় ঃ

দুটি শর্ত পূরণ হলে আগামী বছর পরীক্ষার ফেলের এই চেহারা থাকবেনা। এই শর্তগুলো হলো, ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৭৬ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় শুধু যারা নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদেরই অংশ নেওয়ার অনুমিত দিতে হবে প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এ দুটি শর্ত মেনে চলার জন্য বোর্ডের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তা মেনে চলে না। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ। তিনি বলেন, 'আমরা বিবেকের দংশনে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি। এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের দায়বদ্ধতা আমরা এড়াতে পারি না'। শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন না। প্রি-টেষ্ট ও টেষ্ট পরীক্ষার প্রচলন থাকলেও কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কার্যত তা মেনে চলা হয় না। ঢালাওভাবে ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়াকেই ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রবন্ধে বলা হয়, শিক্ষক সমাজে অসততা ঢুকে যাওয়ার কারণে এমনটা ঘটছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষা হোসনে আরা বেগম বলেন, যখন অভিযোগ শুনি প্রাইভেট পড়ানোর জন্য শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাসে পড়ান না, তখন লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। সিলেবাস পরিবর্তনের কারণে ফল খারাপ হয়েছে, এ যুক্তি দেওয়া ঠিক নয়। কলেজে আসার পর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যে কোন সিলেবাসই থাকে নতুন। দুই বছর ঠিকমতো ক্লাস পরীক্ষা নেওয়া হলে যে কোন বিষয়ে ধারণা পাওয়া সম্ভব। শিক্ষকগণ নিজেরাই সিলেবাস বোঝেননি, এমন প্রশ্নও হয়তো এখন উঠবে। [ভোরের কাগজ, ৩০ আগষ্ট ২০০০]

গাইড বই, নোট বই প্রকাশকদের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় অসুদপায়ের দিনগুলো হয়তো ভালভাবেই

ফুরিয়ে আসছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র এ বিষয়ে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করেছে। এ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও সরাসরি অবদান ছিল। ১৯৯৮ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকার প্রধান প্রধান দৈনিকগুলোর সংবাদদাতাদের সমন্বয়ে ভিলিল্যান্স টিম গঠন করে ঢাকা শহর ও অন্যান্য জেলায় পরীক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছিল। এর ফলে সংবাদপত্রে পরীক্ষায় নকল নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়, যা এর আগে কখনো ঘটেনি। বিশেষ করে পরীক্ষায় শিক্ষক, অভিভাবক, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য এমনকি স্থানীয় সংবাদিকদের অসৎ ভূমিকাও সংবাদপত্রে উন্মোচিত হয়। এর ফলে সারাদেশে একটি বড় ধরণের জনমত সৃষ্টি হয়।

উপসংহার

ভবিষ্যতে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসন, সংবাদপত্র সেবী ও আপামর জনসাধারণ শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার অনুকূলে নিজেদের ভূমিকা সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে সক্ষম হলে এ প্রবন্ধ লেখা স্বার্থক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্য নির্দেশিকা

বাংলাদেশে প্রকাশিত (২০০০ সালের) বিভিন্ন তারিখের দৈনিক পত্রিকাসমূহ।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
১।	অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ, ১৯৬৪	– ডব্লিউ, ডব্লিউ রসটো	টাঃ ৬.৫০/-
২।	প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি ১৯৭০	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ৬.৫০/-
৩।	প্রশাসনের মূলনীতি ১৯৭১	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৪।	প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতাঃ স্মৃতিচারণ ১৯৮৪	নীলুফার বেগম-সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৫।	সরকারী কর্মচারী মহিলা নির্বাহী বিকাশের সমস্যা ১৯৮৭	নীলুফার বেগম	টাঃ ৬.৫০/-
৬।	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা ১৯৮৮	এ, কে, এম হেদায়েতুল হক ও হীরালাল বালা	টাঃ ১২০/-
৭।	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ১৯৯৪	নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান, সম্পাদক	টাঃ ১২৫/-
৮।	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ সংখ্যা, নভেম্বর	বণিক গৌর সুন্দর	টাঃ ৪০/-
৯।	Bangladesh Journal of Public Administration Volume VII Number 1 & II	ড. মীর ওবায়দুর রহমান সম্পাদক	টাঃ ৪০/-
১০।	লোক-প্রশাসন সাময়িকী সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০	মোঃ শফিকুল হক-সম্পাদক	টাঃ ১৫/-
১১।	The Deputy Commissoner in East Pakistan 1964	A. M. A. Muhith	টাঃ ১৬/-
১২।	Administration Policy of the Government of Bengal, 1965	Rokeya Rahman Kabeer	টাঃ ৩০/-
১৩।	Bengal Dist. Administration Committee, 1966 - Govt. of Bengal	Publish by NIPA	টাঃ ৩৫/-
১৪।	Famine Manual, 1967 - Govt. of Bengal	Publish by NIPA	টাঃ ৭/-
১৫।	Problems of Municipal Administration, 1968	M. A. Hussain Khan	টাঃ ৩৫/-
১৬।	Our Cities and Towns, 1970	Md. Jainul Abdin Ed.	টাঃ ২৩/-
১৭।	Administration reforms in Pakistan, 1970	A. N. Shamsul Hoque	টাঃ ৩০/-
১৮।	Social and Administrative Research in Bangladesh, 1973	Naj Nor Begam	টাঃ ১৬/-
১৯।	Social Change and Development in South Asia 1978	Lutful Haq Chowdhury	টাঃ ৪৫/-
২০।	District Administration in Bangladesh 1978	Qazi Azhar Ali	টাঃ ২২/-
২১।	Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants, 1984	Ali Ahmed	টাঃ ৫০/-
২২।	Post-Entry Training in Bangladesh Civil Service : The Challenge and response 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ৪০/-

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
২৩।	Career Planning in Bangladesh, 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ১২০/-
২৪।	Sustainability of Project for Higher Agriculture Education, 1988 & Others	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৫।	Approaches to Rural Health Care : A Case Study of Gonoshastya Kendra, 1988	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৬।	Sustainability of Rural Development Project : A Case Study of Rural Development Project in Bangladesh 1988	Akar Ali Khan and others	টাঃ ৪০/-
২৭।	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh, 1989	A. K. M. Hedhayetul Huq and others	টাঃ ৪০/-
২৮।	Hand Book for the Magistrates, 2nd Ed.1990	Z. A. Shamsul Haq others	টাঃ ১০০/-
২৯।	A Study of the Use of Computers in Management Decision Making in the Public Sector of Bangladesh, 1991	Dr. Ekram Hassain and others A. K. M. Enamul Haque A. Z. M. Shafiqul Alam	টাঃ ৫০/-
৩০।	Administrative Science Review	Published by NIPA	টাঃ ১৫/-
৩১।	Decentralization & People's Participation in Bangladesh, 1983	Dr. Sk. Maqsood Ali M. Safiur Rahman Kshanada Moham das	টাঃ ১৫০/-
৩২।	The Revenud Administration of North Bengal, 1970	A. B. M. Mahmood	টাঃ ৩০/-
৩৩।	Hospital Administration, 1969	N. N. Chowdhury ed.	টাঃ ১৮/-
৩৪।	Survey of In-service Training Institution in East Pakistan, 1969	Syed Nuruzzaman	টাঃ ১৫/-
৩৫।	Bureaucracy in Bangladesh Perspective	A. Z. M. Shamsul Alam	টাঃ ৫০০/-
৩৬।	Limiting the Role of State Prescription of the World Bank & the Bangladesh Economy	Dr. Mir Obaidur Rahaman	টাঃ ১০০/
৩৭।	The Assessment of El Nino Impacts and Responses	Dr. Ekram Hassain and others	টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্ণাল। প্রতি ইংরেজী বছরের জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধ এ সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

◆ প্রবন্ধটি মৌলিক বং অন্য কোন জার্ণালে বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে প্রবন্ধ জমাদেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে

◆ লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মুল পান্ডুলিপির সংগে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ বাংলা কম্পোজ ঃ "বিজয় সুতন্নি" ফন্ট

ইংরেজী কম্পোজ ঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট

◆ প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিসকেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে

◆ প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

◆ মুল কপিসহ পান্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্থ (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদ কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না

◆ ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

◆ প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে

◆ প্রবন্ধের পাদটিকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খন্ড ও ইসু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে

◆ লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন

◆ প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিসকেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

◆ মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।